গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১৮ - ২৪ মে ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নন্দীগ্রামে গণহত্যা ও সেজের বিরুদ্ধে বাঙ্গালোরে এস ইউ সি আই-এর সভা

মূল সমস্যার প্রতিকার না করে সর্বদলীয় বৈঠক ফলপ্রসূ হবে কি

নন্দীগ্রাম নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক সম্পর্কে ১০ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ জানান যে, ঐ দিন সকালে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রী অশোক ঘোষ টেলিফোনে তাঁকে বলেন, নন্দীগ্রাম নিয়ে তাঁরা একটি সর্বদলীয় বৈঠকের ব্যবস্থা করছেন, এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে যেন তাতে যোগদান করা হয়। এ ব্যাপারে তৃণমূল ও সিপিএমের সঙ্গে অশোকবাবুর কথা হয়েছে, তারা যোগ দেবে বলে জানিয়েছে।

শ্রী অশোক ঘোষকে প্রভাস ঘোষ বলেন, ''নন্দীগ্রামে জনগণের মুখপাত্র ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। তাদের বাদ দিয়ে কোনও মীমাংসা বৈঠক হতে পারে না। তাদের সাথে কথা বলতে হবে। আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে সেখানে থাকব।''

প্রভাস ঘোষ আরও বলেন যে, নন্দীগ্রামের মানুষ প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারিয়েছে, পুলিশকে আতঙ্কের চোখে দেখছে। যতক্ষণ খুন ও গণধর্ষণের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করা হচ্ছে, ১৪ মার্চ যে পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে ও নির্দেশে খুন-ধর্ষণ ঘটেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া না হচ্ছে, আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হচ্ছে, আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা তুলে নেওয়া না হচ্ছে এবং আহতদের চিকিৎসা নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তার মীমাংসা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের বৈঠক ফলপ্রসূ হতে পারে না।

শ্রী অশোক ঘোষ জানান যে, সর্বদলীয় বৈঠকে সবই আলোচনা হবে। তখন প্রভাস ঘোষ তাঁকে বলেন, ''কোনও পাড়ায় খুন হলে পুলিশ কি আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকে, নাকি অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে?''

কমরেড প্রভাস ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, প্রস্তাবিত সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই যোগ দেবে কিনা, তা বৈঠকের চিঠি পাওয়ার পরই এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটি স্থির করবে।

শুধু কৃষিই নয়, কৃষিভিত্তিক শিল্পও ধ্বংস হচ্ছে

শুধু কৃষিকেই ধ্বংস করে সিপিএম সরকার সিঙ্গুরে টাটাকে জমি দিচ্ছে তা নয়, একই সঙ্গে ধ্বংস করছে কৃষিভিত্তিক কিছু শিল্পও। সিঙ্গুরের জমি খুবই উর্বর হওয়ায় এখানে সব ফসলই ভাল হয়। এখানে আলুর ফলন বিখ্যাত। আলুর চাষেই শুধু নয়, উৎপাদন পরবর্তী কাজেও এখানে বহু লোক নিযুক্ত। পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং দেখতে সুন্দর রাখার জন্য আলুতে মাখানো হয় ইটের গুঁড়ো। এই কাজে প্রচুর লোক নিযুক্ত। দ্বিতীয়ত, আলুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু হিমঘর। এখানে আলুর প্যাকিং, লোডিং, আনলোডিং, হিমঘর রক্ষণাবেক্ষণ, অফিসের কাজ এবং আলুর বন্ড ইত্যাদিতে বহুলোক নিযুক্ত। তেমনি অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদন পরবর্তী কাজেও বহু লোক যুক্ত। টাটাকে জমি দেওয়ায় এই সমস্ত কাজে নিযুক্ত লোকেদের যে সমস্যা দেখা দেবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত শোনা যাচ্ছে, আম্বানিরা হাইটেক হিমঘর করবে। তা যদি করে তাহলে গ্রামীণ হিমঘরগুলি বিপদের মুখে পড়বে, এগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজ হারাবে। অন্যদিকে হাইটেক হিমঘরে শ্রমিক লাগবে সামান্যই এবং সে শ্রমিক

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশের নতুন সরকারের কাছ থেকেও জনগণের আশা করার কিছু নেই

— এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৩ মে এক বিবৃতিতে বলেন, যদিও ভারতবর্ষে নির্বাচনগুলির ফলাফল অর্থের জোর, পেশীর জোর ও মিডিয়ার প্রচারের জোরে নির্ধারিত হচ্ছে এবং তাতে জনগণের প্রকৃত রায় ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছে না, তথাপি মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টির পুঁজিপতিমুখী, ধনীমুখী, গরিববিরোধী মাফিয়া শাসনে অতিষ্ঠ উত্তরপ্রদেশের জনগণ প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত সংসদীয় দলগুলির নিকৃষ্ট জাতিবাদী ও সাম্প্রদায়িক উস্কানির মধ্যেই নিজ মত প্রকাশের যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তাকেই ক্ষমতাসীনদের অপসারিত করার কাজে ব্যবহার করেছেন। সাথে সাথে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর অতি বিশ্বস্ত দুই দল কংগ্রেস ও বিজেপি, যারা শাসক সমাজবাদী পার্টিবিরোধী জনমানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে গদি দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলছিল, তাদের প্রয়াসকেও ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

কমরেড মুখার্জী দুঃখের সঙ্গে বলেন, রাজ্যের জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা ও দাবিগুলি নিয়ে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো প্রকৃত বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কোনও মোর্চা উত্তরপ্রদেশে নেই। এটা থাকলে সেটাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত বাহক হয়ে একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নির্বাচনেও জনগণের সামনে আসতে পারত। এর অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়েই বুর্জোয়াশ্রেণী অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির একমাত্র বিকল্প রূপে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টিকে তুলে ধরতে পেরেছে। অথচ সকলেই জানেন, ইতিপূর্বে তিনবার মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ব্যাপক দুর্নীতি ও দমনমূলক শাসনের কালা রেকর্ডও তাঁর রয়েছে, যেজন্য শেষবার নিজেকে বাঁচাতে তিনি এমনকী গদি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। গদির সুযোগ-সুবিধার লোভে সিপিআই(এম), সিপিআইয়ের মতো মেকি মার্ক্সবাদীরা যদি বুর্জোয়াশ্রেণীর পায়ে নিজেদের সঁপে না দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে থাকত, উত্তরপ্রদেশের মতোই এখানে-সেখানে একটা দুটো সীট পাওয়ার জন্য সুবিধাবাদী নির্বাচনী জোট গড়ার রাস্তা না নিত, তাহলে উত্তরপ্রদেশের জনগণের সমাজবাদী পার্টিবিরোধী এবং একই সাথে কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী তীব্র বিক্ষোভ থেকে এভাবে মায়াবতীর বিএসপি'র ক্ষমতায় আরোহণ সম্ভব হত না।

কমরেড মুখার্জী বলেন, মায়াবতীর বিএসপি সরকারেরও পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী গরিববিরোধী ও দুর্নীতিমূলক চরিত্র প্রকাশ পেতে বেশি দিন লাগবে না। ফলে, জনগণ যেন এই নতুন সরকারের কাছ থেকে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম আশা না করেন। জনগণ বরং তাঁদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির প্রতিকারের জন্য যথার্থ বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নেতৃত্বে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুন, যেটাই কালক্রমে অবশ্যই বামপন্থী শক্তিগুলির সংহতি ঘটাবে এবং জনগণের সংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে সংগ্রামী ফ্রন্টের জন্ম দিতে সক্ষম হবে।

কৃষির জন্য সিপিএম সরকার কী করেছে?

মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে, সিপিএমের তাবড় নেতারা বেশ কিছু দিন ধরেই রাজ্যজুড়ে শিল্পায়নের দামামা বাজিয়ে চলেছেন। আর এই দামামা বাজাতে গিয়ে তাঁরা কৃষির আর কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁরা শুরু করেছিলেন, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ—এই স্লোগান দিয়ে, যেন দুটিকেই তাঁর সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বোঝা গেল, আসলে এটি তাঁদের মনের কথা ছিল না। টাটা-সালিম-আম্বানিদের জন্য নানা প্রকল্প, স্পেশাল ইকনমিক জোন প্রভৃতির নামে যখন তাঁরা হাজার হাজার একর কৃষিজমি দখল করার কথা ঘোষণা করলেন এবং কৃষকরা তার বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়াই শুরু করলেন, তখনই বেরিয়ে এল আসল কথাটি। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, কৃষির আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। অমনি তার সুর ধরে দলের ওপর থেকে নীচে অবধি অন্ধ কর্মীরা একই স্বরে বলতে লাগলেন, কৃষিতে আর এগোনো সম্ভব নয়, শিল্প ছাড়া ভাবাই যায় না। যে কৃষির সাফল্য নিয়ে তাঁরা গত প্রায় তিন দশক ধরে গর্ব করে আসছিলেন, হঠাৎ তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল কী করে? কোন্ যাদুবলে তাঁরা এমনটি ঘটালেন, তা সিপিএম নেতারাই বলতে পারবেন। কিন্তু কেন কৃষির আর ভবিষ্যৎ নেই, বা বিকাশের কোন্ সর্বোচ্চ শিখরে তাঁরা কৃষিকে পৌঁছে দিয়েছেন, সে কথাগুলি তাঁরা রাজ্যের মানুষকে খোলসা করে জানালেন না।

সত্যিই কৃষির আর বিকাশের সম্ভাবনা আছে কি না, বা তার সমস্যাগুলি কী ধরনের, এ ব্যাপারে রাজ্যের কৃষকরা, যাঁরা হাতে-কলমে কৃষিকাজ করেন, তাঁদের কী মত, তা সিপিএম নেতারা কখনও জানার চেষ্টা করেছেন কি? তা করলে বোধহয় এমন করে কৃষির ভবিষ্যৎকে নস্যাৎ করতে পারতেন না এবং কৃষিতে সরকারের ভূমিকা দেখে অন্তত লজ্জিত হতেন।

সেচের অভাবে রাজ্যের বেশিভাগ জমিই এখনও একফসলি। সেচের ব্যবস্থা থাকলে অনায়াসেই এগুলি দু'তিন ফসলি, এমনকী বহু ফসলিও হতে পারত। তার জন্য কী করেছে রাজ্য সরকার? রাজ্যের খুব সামান্য অংশের জমিতেই নদীপ্রকল্পগুলি থেকে ক্যানেলে বছরে একবার,

দুয়ের পাতায় দেখুন

কৃষির জন্য সিপিএম সরকার কী করেছে?

একের পাতার পর

কোথাও দু'বার জল পাওয়া যায়। এই জলও কখন পাওয়া যাবে, আদৌ পাওয়া যাবে কি না, বেশিরভাগ সময়েই কৃষকরা তা জানতে পারেন না। এই সেচ ব্যবস্থাটুকুরও প্রায় সবটাই সিপিএম সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তৈরি। গত ৩০ বছরে এই সেচ ব্যবস্থার এতটুকুও প্রসার ঘটেনি। বর্তমানে রাজ্যে সেচসেবিত জমির বেশিরভাগ অংশেই জলের প্রয়োজন মেটে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি নলকূপ থেকে। এক্ষেত্রেও সরকারের কোনও সহায়ক ভূমিকাই নেই। রাজ্যের বিস্তৃত অংশে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, পাম্পমেশিন চালাতে হয় দুর্মূল্য ডিজেলে। যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, সেখানে সেচের বিদ্যুতের জন্য দিতে হয় অস্বাভাবিক রকমের বেশি দাম। ক্ষুদ্র কৃষক, এমনকী মাঝারি কৃষকদের পক্ষেও এই ব্যয় বহন করা খুবই কঠিন। দেশের বহু রাজ্যেই কৃষকরা কৃষি-বিদ্যুৎ বিনামূল্যে বা অল্প মূল্যে পান। এ রাজ্যে কৃষকরা তা পান না কেন? যে সরকার হয় কথায়, নয় কথায় বৃহৎ শিল্পপতিদের জন্য কোষাগার থেকে শত শত কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে পারেন, তাঁরা কৃষকদের বিদ্যুতের জন্য ন্যূনতম ভর্তুকিও দেন না, কম মূল্যে ডিজেলের ব্যবস্থাও করেন না।

রাজ্যে বর্ষায় যথেষ্টর চেয়েও বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এই অতিরিক্ত জল ধরে রেখে কৃষির কাজে অনায়াসেই ব্যবহার করা যেত। কৃষির ভবিষ্যৎ নেই বলে যাঁরা বেপরোয়া ঘোষণা করে দিচ্ছেন, তাঁরা গত ৩০ বছরে এর জন্য কী উদ্যোগ নিয়েছেন? রাজ্যের হাজার হাজার মজে যাওয়া নদী-খালগুলি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই। রাজ্যে যে অসংখ্য পুকুর এবং দীঘি রয়েছে সেগুলি সংস্কার করলে বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত জল ধরে রাখা সম্ভব হত। তার জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন তার কোনও ব্যবস্থা কি সরকার করেছে? ফলে প্রতি বর্ষায় নিয়ম করে বান-বন্যায় রাজ্যের অংসখ্য গ্রাম-শহর ভেসে গেলেও বর্ষা শেষ না হতেই দেখা দেয় তীব্র জলসংকট। জলের অভাবে ফসল জমিতে শুকোতে থাকে, কৃষক তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। এই তো কৃষির উন্নয়নে সিপিএম সরকারের ভূমিকা! অন্ধ না হলে অতিবড় সমর্থকও একে সাফল্য বলে গর্ব করতে পারেন কি?

ধান, গম, পাট থেকে শুরু করে শাক-সব্জি পর্যন্ত কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষকরা যে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করেন, তার সিংহভাগটাই আসে অন্য রাজ্য থেকে, এমনকী বিদেশ থেকেও। রাজ্যের সবচেয়ে অর্থকরী ফসল আলুর বীজের সবটা আসে মূলত পাঞ্জাব এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে। পাট বীজ আসে মহারাষ্ট্র থেকে। এ বছর কৃষকরা কালোবাজারে কুইন্টাল প্রতি দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দাম দিয়ে বীজ-আলু কিনেছেন। বাইরে থেকে আসা যে বীজ কৃষকরা ব্যবহার করেন, বহুক্ষেত্রেই সরবরাহকারী সংস্থার কোনও সরকারি স্বীকৃতি থাকে না। ফলে বীজের মানেরও কোনও গ্যারান্টি থাকে না। কৃষকরা বীজ কিনে ঠকেন। উত্তরবঙ্গ জুড়ে পাট এবং গমের বীজ কেলেঙ্কারির কথা অনেকেরই স্মরণে আছে। নিম্নমানের বীজে ফসল না হওয়ায় বারে বারে কৃষকরা খেতে আগুন লাগিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এক্ষেত্রে সরকারের কৃষিদপ্তর কী ভূমিকা পালন করেছে? কৃষকরা যাতে সঠিক মানের বীজ পেতে পারেন, বা উচ্চ-মূল্য দিয়ে বীজ কিনে ঠকতে না হয়, সে ব্যবস্থাটুকু করা কি খুব কঠিন কাজ ছিল? রাজ্যে কৃষিমন্ত্রী আছেন, জেলায়-ব্লকে শত শত অফিসার এবং কর্মীরা রয়েছেন এবং তাঁদের পিছনে জনগণের ট্যাক্সের শত শত কোটি টাকা খরচ হয়ে চলেছে। কৃষকরা যেভাবে সারের ব্যবহার, কীটনাশকের ব্যবহার করেন তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপন ধারণামতো, যার সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোনও সম্পর্ক নেই। মাটি পরীক্ষার সরকারি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ফলে অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের কারণে সারের বিপুল পরিমাণ অপচয় ঘটে, অথচ আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। কীটনাশকের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাই। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে একদিকে দেশি-বিদেশি সার ও ওষুধ কোম্পানিগুলি লাভবান হয়, অন্যদিকে জমির উর্বরা শক্তি ক্রমাগত কমতে থাকে এবং কৃষকরা ক্যানসার সহ নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। ব্লকে যে কৃষি উন্নয়ন অফিসার রয়েছেন, কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা রয়েছেন, রাজ্যে দু'টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সরকার সত্যিই উদ্যোগী হলে তাঁরা কৃষকদের এ ব্যাপারে সচেতন করতে পারতেন। সরকারি ঔদাসীন্যে এসব কিছুই হল না। বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া কৃষি আজও আটকে রয়েছে মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে। সরকারি ঋণ ব্যবস্থাও প্রায় উঠে যাওয়ার কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা মহাজনের ঋণের ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যটুকুও না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টিও সরকার বৃহৎ পুঁজির মালিক ও কালোবাজারিদের হাতে ছেড়ে রেখেছে। এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতা। স্বাভাবিকভাবেই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, ক্ষুদ্র কৃষকের ততোধিক ক্ষুদ্র জোতে কৃষির যেমন উন্নতি সম্ভব, তেমনই হয়েছে। আর একেই সিপিএম নেতারা সর্বোচ্চ উন্নয়ন এবং তাঁদের মহান কীর্তি হিসাবে ফলাও করে প্রচার করছেন।

অর্থাৎ গত ৩০ বছরে কৃষির উন্নয়নের জন্য সিপিএম সরকার কার্যকরীভাবে প্রায় কিছুই করেনি। তা সত্ত্বেও আজ হঠাৎ কৃষিকে অকার্যকরী বলে ঘোষণা করে দিচ্ছে। আসলে দেশি-বিদেশি পুঁজির কাছে সিপিএম তথা সিপিএম-সরকার আজ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষিজমি তাদের হাতে তুলে দিতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই তারা কৃষক তথা দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আজ মিথ্যার জাল বুনে কৃষিকে অকার্যকরী প্রমাণ করতে চাইছে।

শুধু কৃষিই নয়, কৃষিভিত্তিক শিল্পও ধ্বংস হচ্ছে

একের পাতার পর

হল টাই-পরা প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষিত মানুষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে 'শিল্পায়ন হাওয়া' সিপিএম তুলছে তাতে শিল্পায়ন বাস্তবে না হলেও যে দু'চারটি হাইটেক শিল্প হবে তার ধাক্কায় শত শত গুণ বেশি মানুষ কাজ হারাবে। সুতরাং শিল্পায়ন মানেই কর্মসংস্থান — এই সাবেকি ধারণা পুঁজিবাদের বিকাশের স্তরে অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে যতটুকু সত্য ছিল, বর্তমানে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের স্তরে সামগ্রিক বিচারে তা সত্যকে প্রতিফলিত করে না। তীব্র বাজার সঙ্কটে জর্জরিত পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে আজ আর শ্রমিক প্রধান শিল্প গড়তে পারে না। আজ সে শ্রমিক প্রধান শিল্প বন্ধ করছে এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের দিকে ঝুঁকছে। এযুগের শিল্প তাই কর্মসংস্থান যত না করে, কর্মসঙ্কোচন ঘটায় তার থেকে বেশি।

কুলতলিতে সিপিএমের চক্রান্তে খুন-মিথ্যা মামলা-পুলিশি সন্ত্রাস

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে গণহত্যা-গণধর্ষণে কলঙ্কিত সিপিএম একদিকে খেজুরির দিক থেকে নন্দীগ্রামে ক্রমাগত বোমা ও গুলিবৃষ্টি চালিয়ে 'শান্তি', 'শান্তি' বলে মড়াকান্না কাঁদছে, অন্যদিকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এস ইউ সি আইয়ের জনপ্রিয় নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের হত্যার রাজনীতিতে মেতে উঠেছে।

গত ২০০২ সালের ১ অক্টোবর পঞ্চায়েত নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এস ইউ সি আই দলের নলগোড়া অঞ্চলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেডস্ অশোক হালদার ও মোসলেম মিস্ত্রীকে সিপিএম নেতা রামশঙ্কর হালদারের নেতৃত্বে কুখ্যাত দুষ্কৃতী সাজাহান লস্করের বাহিনী স্থানীয় পার্টি অফিসে চড়াও হয়ে হত্যা করেছিল।

এবারও সিপিএম একই পথ নিয়েছে। গত ৬ এপ্রিল এস ইউ সি আই সমর্থক কমরেড সুনীল নস্করকে প্রকাশ্য দিবালোকে জামতলা হাট থেকে ফেরার পথে গলা কেটে মাথাটি তারা পুকুরে ফেলে দেয়। এই ঘটনা সিপিএম-এর স্থানীয় নেতা বাক্কার সরদার ও রবিরাম হালদারের নেতৃত্বে ঘটানো হয়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করেনি। উপরন্তু হত্যাকারীরা স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে যাচ্ছে। এরপর গত ২৮ এপ্রিল রাতে ট্যাংরাবীচি গ্রামে এস ইউ সি আই কর্মী সহর আলী ঢালীকে তারা গলা কেটে হত্যা করে। দলের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বহু এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীকে সিপিএম, পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করে রেখেছে এবং আরও অসংখ্য কর্মীকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করছে। এভাবেই সিপিএম কুলতলি-জয়নগরে এস ইউ সি আই-কে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী কুলতলি-জয়নগরের মানুষ আজও মাথা উঁচু করে সিপিএমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কুলতলি-জয়নগরের মাটি কমরেডস শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, আমির আলি হালদার, ইয়াকুব পৈলানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রায় দেড় শতাধিক বিপ্লবী কর্মী, জোতদার ও ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে অধিকার অর্জন ও রক্ষার সংগ্রামে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। বারবার রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরাস্ত হতমান সিপিএম পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবার পুলিশ-প্রশাসন এবং সমাজবিরোধীদের নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কুলতলি এবং জয়নগরের বিভিন্ন এলাকায় সিপিএম ও পুলিশের মদতে সমাজবিরোধীরা নকল সোনা ও সোনার মূর্তির ব্যবসা চালায়। সিপিএম সমর্থক হওয়ার কারণে পুলিশ-প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। গত ২৮ এপ্রিল জালাবেড়িয়ার পরিত্যক্ত 'তারা ইটভাটা'য় এই রকম নকল সোনা ও প্রাচীন মূর্তির চোরাকারবারী দুই কুখ্যাত ডাকাত মাজেদ আলি ঘরামি ও ছামিরুল মোল্লার মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। স্থানীয় মানুষ, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, ডাকাতির টাকা ভাগ বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে এই খুন সংঘটিত হয়েছে। এরপর ঐ দিন সন্ধ্যা নাগাদ বহু খুনের এবং অপকর্মের নায়ক কান্তি গাঙ্গুলী জামতলায় হাজির হয়ে মৃত মাজেদ আলি ঘরামির দাদা সিপিএম নেতা সৈয়দ আলি ঘরামিকে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, এই খুনের ঘটনায় মেরীগঞ্জ ১নং অঞ্চলের দায়িত্বশীল এস ইউ সি আই নেতাদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করতে হবে। সৈয়দ আলি ঘরামি এই খুনকে কোনমতেই রাজনৈতিক খুন বলতে অস্বীকার করলে, চাপ দিয়ে তাঁর পরিবারের একজনকে দিয়ে এফ আই আর করানো হয়। তারপর থেকে মেরীগঞ্জ-১ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় পুলিশ এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করার অভিযানে নেমে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত পরিচালনায় ব্যাপক দুর্নীতি ও এস ইউ সি আই দ্বারা আনীত অনাস্থায় সিপিএম পঞ্চায়েত প্রধান অপসারিত হওয়ার কারণেই মেরীগঞ্জ-১ এর এস ইউ সি আই নেতাদের বিরুদ্ধে সিপিএমের এই ক্রোধ। এছাড়া বিগত দিনে কান্তি গাঙ্গুলী মেরীগঞ্জ-১ অঞ্চলে বার-বার সভা করতে গিয়ে জনশূন্য মাঠ দেখে ফিরে এসেছেন। ফলে সিপিএম, মেরীগঞ্জ-১ এর মানুষের ঘৃণার জবাব দেবার জন্য পুলিশ-প্রশাসন এবং সমাজবিরোধীদের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এভাবেই তারা এস ইউ সি আইয়ের বহু নেতা-কর্মীকে খুন করেছে, মিথ্যা-মামলায় কারারুদ্ধ করেছে। কিন্তু বহু সংগ্রামের স্মৃতি বহনকারী কমরেড মোকাররম খাঁন, কমরেড ছাইফুল সরদার, পঞ্চু রায় নস্কর, সাহাবুদ্দিন খাঁন (টিটো)-এর মতো অমর শহীদদের রক্তে ভেজানো মেরীগঞ্জ-১ এর মানুষ, অত্যাচারিত, ঘৃণিত সিপিএম-এর সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না। এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার কুলতলি-জয়নগর, তথা সারা জেলার সংগ্রামী মানুষের কাছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে মেরীগঞ্জ-১ অঞ্চলে লড়াকু মানুষদের পাশে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের কনভেনশন বালুরঘাটে

নন্দীগ্রামে গণহত্যার প্রতিবাদে গত ২৯ এপ্রিল বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে চার শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় 'শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বোস ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ মেহের ইঞ্জিনিয়ার, 'শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চে'র রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামল চক্রবর্তী, অরূপশঙ্কর মৈত্র, রূপশ্রী কাহালি, অধ্যাপক মানস জানা প্রমুখ। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক মলয় চক্রবর্তী। ডঃ মেহের ইঞ্জিনিয়ার পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে সর্বনাশা এস ই জেড চালুর প্রতিবাদ করেন। অধ্যাপক মানস জানা পুলিশ ও সরকারের বড় শরিক দলের ক্রিমিনাল বাহিনী যে বর্বর আক্রমণ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সংগ্রামী চাষীদের উপর নামিয়ে এনেছে তাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। এই কনভেনশনে মঞ্চের জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সুদীপ্ত তরফদার এবং অধ্যাপক প্রভাস মণ্ডল যথাক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও সভার মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জেলা শাখার সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ সাগর মোদক ও অমলেন্দু চন্দ এবং কোষাধ্যক্ষ দীপক কর সরকারি বর্বরতার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কনভেনশনে অরূপশঙ্কর মৈত্র রচিত শ্রুতিনাটক 'শাসন ধর্ষণ, জীবন দর্শন' পরিবেশন করেন শ্যামল চক্রবর্তী ও রূপশ্রী কাহালি। সিঙ্গুর আন্দোলনের উপর রচিত কয়েকটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বপ্না মোদক।

ফ্যাসিবাদবিরোধী বিজয় দিবসের মিছিলে রাশিয়ার জনগণের হাতে হাতে স্ট্যালিনের ছবি

৯ মে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার বিজয় দিবস। ৬২ বছর আগে, এইদিন হিটলারবাহিনী সোভিয়েট লালফৌজের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবির অনবরত স্ট্যালিনবিরোধী প্রচার করেও তাঁর স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে দিতে পারেনি। এ বছর বিশ্বের নানা দেশে এবং পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নে এই দিনটিতে মানুষ পথে নেমেছে স্ট্যালিনের ছবি হাতে নিয়ে। যত দিন যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ যত বাড়ছে, আফগানিস্তান, ইরাক যুগোস্লাভিয়ার মতো সাম্রাজ্যবাদী সামরিক হানাদারি যত ঘটছে, ততই মানুষ বুঝতে পারছেন কী তাঁরা হারিয়েছেন। তাঁরা ভাসাভাসাভাবে হলেও বুঝতে পারছেন, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে কেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিশ্বজোড়া উৎসবে মেতেছিল। আবার মানুষ আন্দোলনে নামছেন, তাই অনিবার্যভাবেই স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের অপরাজেয় অগ্রযাত্রাকে তাঁরা আবার স্মরণ করছেন।

এপ্রিলের শেষ দিকেই লাল ফৌজ বার্লিন পৌঁছায়। পরাজিত হিটলারের আত্মহত্যা বা মৃত্যুর পর নাৎসি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিল্ডমার্শাল কাইতেল আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশ্ব সর্বহারার মহান নেতা লেনিনের যোগ্যতম উত্তরসূরী জোসেফ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লালফৌজের এই বিজয় দেখিয়ে দেয় আজকের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ আর মানবতার স্বার্থ এক ও অভিন্ন হয়ে মিশে আছে। তাই রমাঁ রঁলা, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিশ্বের প্রথম সারির অকমিউনিস্ট মানবতাবাদী মনীষীদের চোখেও স্ট্যালিন ছিলেন মানবতার রক্ষাকর্তা, বিপন্ন মানবসভ্যতার মহান ত্রাতা।

লালফৌজের এই বিজয়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কেবল ফ্রন্টে নয়, লড়াই ছিল কলে-কারখানায় খনিতে খেতে বাগিচায় সর্বত্র, সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে। ফ্রন্টে লড়তে লড়তেই ক্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়ে লালফৌজের অস্ত্র, খাদ্য, রসদ জ্বালানির সরবরাহ অটুট রাখার লড়াই, অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে যাঁরা প্রাণ দিচ্ছেন তাঁদের অনাথ স্ত্রীপুত্রদের সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনের লড়াই। মার্কিন সাংবাদিক মরিস হিন্ডিস লিখেছেন, সে সময়ে লন্ডনের রাজপথ অনাথ নারী আর শিশুতে ভরে গিয়েছিল অথচ রাশিয়ায় তা ঘটেনি, কারণ যৌথখামারে তারা শুধু কাজ পায়নি, পেয়েছিল পারিবারিক সম্পর্ক। হিন্ডিস লিখছেন— যৌথ খামার না দেখলে বোঝা যাবে না কী করে রাশিয়া এই যুদ্ধের আঘাত সামলাতে পেরেছিল। যৌথখামার ছিল স্ট্যালিনের কঠোর সংগ্রামের ফসল। লাল ফৌজের শীর্ষে ছিলেন সেনাধ্যক্ষরা, যৌথখামারে ছিলেন পার্টির নেতারা, কলেকারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যাপক জনজীবনে ছিল সোভিয়েটগুলির নেতৃত্ব এবং সকলের উপরে ছিলেন স্ট্যালিন। কেবল লালফৌজের সেনাদের নয়, গোটা সোভিয়েট জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়াকে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষার একমুখী অবিচল লক্ষ্যে পরিচালিত করেছিল স্ট্যালিনের নেতৃত্ব। হিটলার বাহিনীর পরাজয়ের পর তেহেরান সম্মেলনে ব্রিটেনের রাজার পক্ষ থেকে বিজয়স্মারক তরবারি তুলে দেওয়া হয় স্ট্যালিনের হাতে। স্ট্যালিন, আক্ষরিক অর্থে লৌহমানব স্ট্যালিনের চোখে প্রত্যক্ষদর্শীরা জল দেখেছিলেন। কী সেই জলের উৎস, স্ট্যালিন তা বলে যাননি, কিন্তু অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি, প্রাকৃতিক সম্পদের অসীম অপচয় তাঁকে বিচলিত করেছিল, যার প্রমাণ আমরা পাই যুদ্ধ পরবর্তীকালে জেনারেল ঝুকভের স্মৃতিকথায়।

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই বিজয়ের পিছনে ছিল এক দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাস। প্রায় বছর কুড়ি আগেই বিশ্বপরিস্থিতিকে মার্কসবাদী বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে স্ট্যালিন বুঝেছিলেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলি একজোট হচ্ছে। নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব মীমাংসার নামে ১৯২৫ সালেই লোকার্নো চুক্তির মধ্য দিয়ে ব্রিটেন ফ্রান্স আমেরিকা চেষ্টা করছে জার্মানিকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে। ১৯২৫ সালেই হিটলার তার আত্মজীবনী মাইন কাম্ফ-এ ঘোষণা করেছে — জার্মান জাতির বাঁচার জন্য নতুন ভূখণ্ড চাই। সোভিয়েটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ইউক্রেনে জার্মান বংশোদ্ভূত মানুষ রয়েছে এই অজুহাতে হিটলার ইউক্রেনের উপর জার্মানির দাবি জানায়। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ কংগ্রেসে স্ট্যালিন দেখান কীভাবে তথাকথিত গণতন্ত্রের শিরোমণিরা জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে শক্তি যোগাচ্ছে সোভিয়েট আক্রমণের জন্য। আসন্ন সেই আক্রমণ থেকে বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশকে বাঁচানো, ফ্যাসিবাদের গ্রাস থেকে বিশ্বমানবতাকে বাঁচানোর অভ্রান্ত যে পথটি স্ট্যালিন বেছে নেন তা হল, কৃষি ও শিল্পে নজিরহীন গতিতে উন্নতি করে দ্রুত শিল্পোন্নত দেশগুলিকে ধরে ফেলা, গোটা দেশের জনগণ ও লালফৌজকে অপরাজেয় নৈতিক বলে দীক্ষিত করা এবং দেশের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শত্রুর চর ও বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে নির্মূল করা। পার্টি বা মিলিটারির শীর্ষ পদাধিকারীরাও দেশদ্রোহী হলে তিনি তাঁদের ক্ষমা করেননি। রুশবিপ্লবের অব্যবহিত পর গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি দেখেছিলেন শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য কীভাবে চৌদ্দটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সামরিক অভিযান চালিয়েছিল শুধু নয়, তাদের সহায়তায় দেনিকিন কলচাকের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রবিরোধী আভ্যন্তরীণ শক্তি ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর নির্লজ্জ দেশদ্রোহিতার দ্বারা সমাজতন্ত্রকে প্রায় মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিয়েছিল। সেদিনও লেনিনের দেওয়া দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে ঘরশত্রুদের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে নির্মম হতে হয়েছিল। নরঘাতক দেশদ্রোহী শ্বেতবাহিনীর শীর্ষনেতৃত্বকে ক্ষমার চোখে দেখার অর্থ ছিল অগণিত প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বিশ্বের একমাত্র সমাজতন্ত্রকে বলি দেওয়া। সেই ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে স্ট্যালিন প্রশ্রয় দেননি। সমাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য মানবতাবাদের প্রচলিত বুর্জোয়া ধারণাকে ছাড়িয়ে মহত্তর সর্বহারা মানবতায় পৌঁছেছিলেন তিনি। সেজন্য দেশ ও সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনের প্রতি প্রশ্নাতীত মমতা থেকে ব্যক্তিগত বিচারে মমতার নামে সবরকম দুর্বলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে তিনি ব্রতী হন। স্ট্যালিন চরিত্র বোঝার সঠিক মাপকাঠি কী, তা তুলে ধরে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন—''স্ট্যালিনের চরিত্রের বহু দিক যেগুলো মানবতাবাদী মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করলে নেতিবাচক দিক বলে মনে হবে, একমাত্র কমিউনিস্ট মূল্যবোধের আধারেই সেই সব দিকগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব।''

লেনিনের মৃত্যুর পর, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে কৃষি শিল্প শিক্ষায় উন্নত করা শুধু নয়, সে দেশে উন্নত নৈতিকবোধে উদ্বুদ্ধ নতুন ধরনের মানুষ তিনি গড়ে তোলেন। সেই ধরনের মানুষ যারা বুকে হাত দিয়ে অমিততেজে বলতে পারে — আমি শুধু মানুষ নয়, আমি সোভিয়েটের মানুষ, আমাকে মারা যাবে কিন্তু দাসত্বে বাঁধা যাবে না। এই অদম্য মনোবল সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজকে অপরাজেয় শক্তির অধিকারী করেছিল এবং দুনিয়ার চোখে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই দেশে দেশে হিটলারের বিজয় রথ যখন বাধাহীনভাবে এগোচ্ছিল তখন প্রথম তা জোরালো বাধা পায় রাশিয়ায়। নাৎসিবাহিনী বেলজিয়াম দখল করেছিল একদিনে, ফ্রান্স সাতদিনে। সর্বত্র ঘরশত্রুরা ফ্যাসিস্ট সেনাদের ঘরে ডেকে এনেছে, কিন্তু রাশিয়ায় তাঁরা ঘরশত্রু খুঁজে পায়নি।

এবারের ৯ মে মস্কোর রেড স্কোয়ার

ত্রিশের দশকে, বহুল প্রচারিত 'স্ট্যালিনের সন্ত্রাসের' দিনগুলিতে জোসেফ ডেভিস মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে ছিলেন মস্কোয়, দেশদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্তদের প্রতিটি বিচারসভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। আইনি নিরীখে এইসব বিচারে তিনি কোন ফাঁক দেখতে পাননি— এই রিপোর্ট তিনি অফিসিয়ালি পাঠিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। ''রাশিয়ায় ঘরশত্রুরা কোথায়'' নিজেকে প্রশ্ন করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস। যুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতার নিরীখে আমেরিকায় উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনি বলেছিলেন — ত্রিশের দশকের সেই ঝড়ো দিনগুলোর তাৎপর্য আজ বুঝতে পারছি। রাশিয়ায় ঘরশত্রুরা থাকলে পরাজয় যে অনিবার্য সেকথা স্ট্যালিন জানতেন। তাই জার্মান আক্রমণের বিপদ বুঝে ঘরশত্রুদের নির্মূল করার কাজে তিনি হাত দেন। এই প্রশ্নে নিজের আত্মীয় পরিজন বা বন্ধু বলে কেউই তাঁর কাছে ক্ষমা বা কোন বিশেষ সুবিধা পায়নি। তাঁর প্রিয় পুত্র, সোভিয়েট বিমানবাহিনীর অফিসার, জার্মানদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। গোপনে জার্মানরা প্রস্তাব দেয় জার্মান সেনাপতি ফন পাউলুসকে মুক্তি দিলে জার্মানরা স্ট্যালিনের ছেলেকে মুক্তি দেবে। ঝুকভ লিখেছেন, স্ট্যালিন সে প্রস্তাব খারিজ করে দেন এই বলে যে, পদমর্যাদায় ফন পাউলুস অনেক বড় সেনাপতি, কাজেই বন্দি বিনিময় সমানে সমানে হওয়াটাই নীতি, তার ব্যতিক্রম হবে না। তারপর স্ট্যালিন বলেন ঝুকভকে — 'যুদ্ধ কী ভয়াবহ, রাশিয়ার ঘরে ঘরে মায়েরা সন্তান হারিয়েছেন। আমি জানি ফ্যাসিস্টরা আমার ছেলের ওপর বহু অত্যাচার করবে, কিন্তু আমি নিশ্চিত সে দেশের বিরুদ্ধে কিছু করবে না।' পুত্র লালফৌজের সদস্য— এ ছিল তাঁর গৌরব।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় লালফৌজ। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের শাসকদের তৈরি বেতনভোগী সেনাবাহিনীর সঙ্গে লালফৌজের পার্থক্য ছিল মৌলিক। দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ লালফৌজকে ত্রাতা হিসাবে দেখেছিল শুধু তারা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রাণ দিচ্ছে বলে নয়, আচারে আচরণে শৃঙ্খলায় জনগণের প্রতি ব্যবহারে লালফৌজ ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তারা যখন রাশিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে পূর্বইউরোপের দেশগুলির মধ্য দিয়ে চলেছিল বার্লিনের অভিমুখে তখন দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ তাদের ত্রাতা বলে অভিনন্দন জানিয়েছিল। আন্তর্জাতিকতার আদর্শে দীক্ষিত এই বাহিনীর বিরুদ্ধে তাই শ্রেণীশত্রুদের মিথ্যা প্রচারেরও অভাব হয়নি।

জার্মানবাহিনী যখন রাশিয়ায় ঢোকে তখন বেশ কিছু সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তি ইউক্রেনে, ককেশাসে, চেচনিয়ায় লালফৌজের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। কিন্তু প্রশাসনের, দলের ও রাষ্ট্রের শীর্ষে তারা দেশদ্রোহী নেতা খুঁজে পায়নি। স্ট্যালিনের তথাকথিত 'নির্মমতা' রুশ জনগণ, সমাজতন্ত্র সহ গোটা মানবসভ্যতাকে ফ্যাসিবাদের পদানত হওয়ার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। দলের অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্ট্যালিন বলেছিলেন— এই কর্মযজ্ঞে আমাদের ভুল কিছু হয়েছে কিন্তু মোটের ওপর সবটাই হয়েছে ভালর জন্য।

স্ট্যালিনের কাছাকাছি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই দেখেছেন মানবিক, সংস্কৃতিবান, নিঃস্বার্থ এক মহামানব স্ট্যালিনের মধ্যে এমন কিছু জিনিস, যা তাঁদের চোখে অস্বাভাবিকতা, নির্মমতা বা ক্রুরতা, তাই কেউ কেউ বলেছেন স্ট্যালিন ছিলেন খলচরিত্রের, অমানবিক। এর উত্তর দিয়েছেন স্ট্যালিন নিজে, তিনি বলেছেন —আমি কঠোর, লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের প্রতি আমি যথার্থই কঠোর। দেশ, দেশের জনগণ, শ্রমিকশ্রেণী, মানবতা এবং স্ট্যালিন একাকার হয়ে মিশে এককালের জোসেফ ভ্যাসারিওনোভিচ জুগাসভিলি বিশ্ববন্দিত স্ট্যালিনে পরিণত হয়েছিলেন। দুনিয়ার হৃদয়জয়ী এই মহামানবের মৃত্যুকালে নিজের বলতে ছিল দু'সেট সামরিক পোষাক আর কিছু খুচরো পয়সা, আর বিশ্বমানবের জন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিশ্বশান্তির অপারাজেয় শক্তি সোভিয়েট সমাজতন্ত্র।

এমনকী ৯মে জার্মানবাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন প্রাপ্য গার্ড অব অনার নেওয়ার দুর্লভ সম্মান তিনি তুলে দিয়েছিলেন তরুণ মার্শাল ঝুকভের হাতে। ঝুকভ লিখেছেন, আমরা তো যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছি, কিন্তু কৃষি থেকে খাদ্য, শিল্প থেকে অস্ত্র, খনি থেকে পেট্রল সেনাবাহিনীর জন্য সবধরনের রসদ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা, সমগ্র জনগণকে প্রাণ বাজি রেখে লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করার প্রায়-অসম্ভব কাজটা যিনি করেছিলেন তিনি হলেন স্ট্যালিন।

আজ কথায় কথায় স্ট্যালিন আর হিটলারকে এক করে দেখানোর সাম্রাজ্যবাদী রীতি প্রচলিত ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রচার শুরু করেছিল জার্মান ফ্যাসিস্টরা, তাদের হাত থেকে এই মিথ্যা প্রচারের কাজটা নিজের কাঁধে তুলে নেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু মানবতার শত্রুদের এই প্রচার কার্যকর হত না যদি না সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব এবং মার্কসবাদী ভেকধারীরা দেশে দেশে স্ট্যালিনবিরোধিতার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রকে কলঙ্কিত করত। সংশোধনবাদীরা সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর মেলানোর ফলে একটা ডাহা মিথ্যাও

আটের পাতায় দেখুন

সংগ্রামী বামপন্থী ধারায় শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন দ্বারাই একমাত্র সিপিএমকে পরাস্ত করা সম্ভব

কলকাতায় ২৪ এপ্রিলের সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

(এস ইউ সি আই-এর ৫৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে গত ২৪ এপ্রিল শহীদ মিনার ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে বক্তব্য রাখেন তার কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করা হল। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ইয়াকুব পৈলান।)

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ভারতবর্ষের একটা ঐতিহাসিক সঙ্কটজনক মুহূর্তে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনে এস ইউ সি আই দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যখন '৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের ফলে কারাগারে বন্দী, তখন দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে চলেছে। এই সংবাদে অনেকে উল্লসিত, কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে শত শত যুবক আত্মাহুতি দিয়েছেন, সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছেন, সেটা ব্যর্থ হওয়ার মুখে। কারণ ভারতবর্ষের জাতীয় পুঁজিবাদের অর্থাৎ টাটা, বিড়লাদের স্বার্থে পরিচালিত কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী আপসমুখী নেতৃত্ব, এদেশের ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রদের মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদকে কোণঠাসা করে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করেছিল এবং তার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পরিবর্তে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শোষণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছিল।

কেন এই সর্বনাশ ঘটল? এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি এযুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে বুঝেছিলেন, এদেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে গড়ে ওঠেনি। মার্কসবাদী দল গড়ে ওঠার জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, যে মার্কসবাদী জীবনদর্শন, যে বিপ্লবী আদর্শ, বিপ্লবী সংস্কৃতি, বিপ্লবী রণনীতি এবং রণকৌশল দরকার, এসব সেযুগের এই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা, তাঁদের সততা, ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে পারেননি। এবং সেজন্যই অবিভক্ত সিপিআই শ্রমিকশ্রেণীর দলের পরিবর্তে একটা পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর দলে পর্যবসিত হয়েছিল। যেমন রাশিয়ায় মার্কসবাদের নামে মেনশেভিক পার্টি; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নানা দেশের পার্টিগুলো গড়ে উঠেছিল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট হিসাবে। এরা মার্কসবাদী দল ছিল না বলেই সেই সময় মহান স্ট্যালিনের নির্দেশ সত্ত্বেও অবিভক্ত সিপিআই নেতাজীদের মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের সাথে ঐক্য করে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করার কোন উদ্যোগ নেয়নি, বরং দক্ষিণপন্থীদেরই নানাভাবে কার্যত সাহায্য করেছে। এজন্যই গুটিকয়েক সহকর্মী নিয়ে যতই কঠিন কঠোর সংগ্রামসাপেক্ষ হোক, কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দলটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক— সমস্ত দিক থেকেই কী চরম দুর্গতির মধ্যে আমরা রয়েছি। যদিও নেতারা বলছেন, দেশের উন্নয়ন চলছে। 'উন্নয়ন' আর 'শিল্পায়ন'— এই দুটি স্লোগান এখন ভারতবর্ষের ক্ষমতাসীন সমস্ত দলের নেতারাই আওড়াচ্ছেন।

এই গণহত্যা কি নিছক ভুল?

ভারতবর্ষে এখন বুর্জোয়া দলগুলির দুটি জোট। বিজেপির নেতৃত্বে এন ডি এ জোট, আর একটা সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ জোট। এর মধ্যে সমস্ত গদিসর্বস্ব পার্টিগুলো আছে। আর এরা সকলেই 'উন্নয়ন হচ্ছে', 'শিল্পায়ন হচ্ছে' প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা মার্কসবাদী হিসাবে যথার্থ উন্নয়ন চাই, যথার্থ শিল্পায়ন চাই। কিন্তু উন্নয়নের নামে, শিল্পায়নের নামে ভাঁওতা দেওয়ার, লোকঠকানোর বিরুদ্ধে আমরা। এ রাজ্যে সিপিএম নেতারা কত উন্নয়ন করছেন, কত শিল্পায়ন করছেন তার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদিনই। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের দলের কিছু অন্ধ কর্মী-সমর্থক এবং তাঁদের স্তাবক কিছু বুদ্ধিভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার পর ঐ দলে আজও যাঁরা সৎ মানুষ, বিবেকবান মানুষ আছেন, যাঁদের মধ্যে এখনও শোষিত জনগণের প্রতি, বামপন্থার প্রতি, কমিউনিজমের প্রতি আবেগ আছে, তাঁরা অনেকেই বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করছেন। অনেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, চোখের জল ফেলছেন। তাঁদের আজ বিবেকদংশন হচ্ছে একথা ভেবে যে, এতদিন এরকম একটা দলকে তাঁরা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ঐ দলে আবার এমন অনেকেই আছে, যারা দল যা-ই বলবে, নেতারা যা-ই বলবেন, এবং নেতারা মিথ্যা কথা বলছে, জনগণকে ঠকাচ্ছে একথা বুঝেও তারা নেতাদের কথা শুনে হাততালি দেয়। কয়েকদিন আগে এই ময়দানেই মুখ্যমন্ত্রী বলে গেলেন, 'কারও চোখের জল ফেলে কৃষিজমি নেবেন না'। অথচ দলে একটা লোক নেই, যে প্রশ্ন করতে পারে যে, সিঙ্গুরে তুমি কী করেছ? সিঙ্গুরের এতগুলি পরিবার— তাদের একমাত্র অবলম্বন কৃষিজমি কেড়ে নিয়েছ, সবুজ মাঠ ধ্বংস করে সেখানে কংক্রিটের প্রাচীর তৈরি করছ। আজ কি সিঙ্গুরের মানুষ আনন্দ করছে, না চোখের জল ফেলছে ? সেখানে একটি যুবককে লাঠিচার্জ করে মারলে, একটি কিশোরীকে ধর্ষণ করে হত্যা করালে, এক বৃদ্ধ শোকে আত্মহত্যা করল। এর পরও দলের কেউ প্রশ্ন করল না যে, 'কারও চোখের জল ফেলে কৃষিজমি নেব না,' মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন কী করে! নন্দীগ্রামে পুলিশকে দিয়ে এবং দলের কর্মী যাদের ক্রিমিনাল বানিয়েছ, তাদের দিয়ে এত মানুষকে হত্যা করালে, এতগুলি নারীকে ধর্ষণ করালে, সেজন্য ন্যূনতম অনুশোচনা নেই, আত্মধিক্কার নেই! তার পরও নেতা বলতে পারলেন, এবং পার্টির কাগজে সে কথা ছাপাও হল যে, ''চোখের জল ফেলে কৃষিজমি নেব না''। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ভুল করেছি। এটা কি ভুল? এটা তো একটা ভয়ংকর ক্রাইম! লোককে হত্যা করানো, ধর্ষণ করানো — এগুলো কি একটা ভুল? ধরুন, আমাদের স্ত্রীকে, কন্যাকে ধর্ষণ করানো হল, তারপর যে একাজ করলো, সে যদি বলে আমি ভুল করেছি, তাকে কি ছেড়ে দেওয়া হবে, এভাবে সে পার পেয়ে যাবে? অথচ আমাদের দেশে পার পেয়ে যাচ্ছে। এটা যেন মুখ্যমন্ত্রীর মহত্ত্ব— তিনি ভুল স্বীকার করেছেন! এত মানুষকে উচ্ছেদ ও হত্যা করার পর 'কারও চোখের জল ফেলে কৃষিজমি নেবেন না'— এ যেন তাঁর একটা মহৎ ঘোষণা! এভাবেই সেটা কাগজে আসছে, টিভিতে প্রচার হচ্ছে। সিপিএমের মধ্যে তবুও প্রশ্ন উঠছে না। আমি জানি, ৫০ সালে যদি অবিভক্ত সিপিআই-তে এ ঘটনা ঘটত, এমনকী ষাটের দশকে সিপিএম-এ যদি ঘটত, তখনও কিছু লোক বেঁচে ছিলেন যাঁরা অন্তত দলে প্রশ্ন তুলতেন। নেতারা আজ দলকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে! ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অতি নাটকীয় ঢংয়ে কপালে হাত দিয়ে বলছেন, 'আমি দায় স্বীকার করছি'। একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার মতো আচরণ! কর্মীরা হাততালি দিল। প্রসঙ্গত আপনাদের একটা কথা বলি। ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর নাম হয়ত এখনকার অনেকেই জানেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে তিনি একজন বড় মানুষ ছিলেন। ওড়িশার মানুষ তাঁকে দেশবন্ধুর মতই শ্রদ্ধা করতেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন বাদে ঐ রাজ্যে কোন বিক্ষোভ দমনে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল, এটা তাঁর নির্দেশেও হয়নি, তবুও তিনি পদত্যাগ করলেন। বললেন, মন্ত্রীত্বে থেকে যদি গুলি চালিয়ে পাবলিককে হত্যা করতে হয়, সেই মন্ত্রীত্ব আমার দরকার নেই। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করানোর জন্য, কিন্তু তাঁকে টলাতে পারলেন না। এই দৃষ্টান্ত সবাই ভুলেই গেছে। সেই যুগে আর ক'জন মুখ্যমন্ত্রী এরকম করতে পেরেছেন? আর এখনকার নেতাদের তো মন্ত্রী না হতে পারলে জীবনই বৃথা!

নেতার মিথ্যাচারেও কর্মীরা হাততালি দেয়

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, গতকালই রাজ্যপালের কাছে আমাদের দলের নন্দীগ্রামের নেতারা ধর্ষিতা মহিলাদের নিয়ে এসেছিলেন। তারা কাঁদতে কাঁদতে নির্যাতনের ঘটনা বলে গেলেন। এরা এখনও কোনও বিচার পায়নি। সেটা যাতে না পায়, সেজন্য, তারা যে ধর্ষিতা হয়েছেন, সিপিএমের নির্দেশে সেকথা পর্যন্ত হাসপাতাল ডিসচার্জের রিপোর্টে লেখা হয়নি। এর নাম দায় স্বীকার করা, ভুল স্বীকার করা? কতবড় নির্দয় স্বৈরাচারী হলে এমন অভিনয় করতে পারেন! লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, ওরা অর্থনৈতিক দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন করলেও শ্রেণীসংগ্রামকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করতে বাধা দেয়, ওরা সশস্ত্র বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়ত্বের বিরুদ্ধতা করে, ওরা হচ্ছে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসের শক্তি। সিপিএম সোস্যাল ডেমোক্র্যাট হিসাবে এদের থেকেও অনেক নিচুতে নেমে গেছে। আজ ওরা বলে, 'ধর্মঘট করবে না, শিল্পে শান্তি নষ্ট করবে না, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন চলবে না, মালিক মজুর বন্ধুত্ব চাই'। কারণ সিপিএম নিজেই দাবি করছে তারা 'ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি' অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট করছে যে দেশি-বিদেশি পুঁজি, ওরা তাদের বন্ধু। একদল প্রচার করছে, সিপিএম 'মার্কসবাদী' বলেই এসব করছে। কৃষিজমি দখল করা, সেজ গঠন করা, গুলি করে কৃষক-শ্রমিক খুন করা, নারী ধর্ষণ করানো, এসব যদি মার্কসবাদী বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে তো বলতে হয়, গুজরাট, ওড়িশা, অন্ধ্র, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র সব সরকারই 'মার্কসবাদীরা' চালাচ্ছে!

একসময় অবিভক্ত সিপিআই পরে ছয়ের দশকে সিপিএম-এর তত্ত্ব, নীতি-আদর্শ অমার্কসবাদী হলেও নিচুতলার কর্মীরা অধিকাংশ সৎ ও ডেডিকেটেড ছিল, আর আজ গোটা দলই মাসল পাওয়ার, মানি পাওয়ার ও এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গণআন্দোলন দমনে আজ সিপিএম নেতারা শুধু পুলিশি আক্রমণই নয়, সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী, পুলিশের পোষাক পরা ক্রিমিনাল ব্যবহার করছে, যথেচ্ছ খুন ও ধর্ষণ করাচ্ছে, নামতে নামতে সিপিএম আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে মিথ্যাচার, অন্যদিকে বিরোধিতার কণ্ঠরোধ, এই নৃশংস দমন-পীড়ন, এ কিসের ইঙ্গিত! ফ্যাসিবাদী আচরণের সাথে পার্থক্য থাকছে কি ? কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগে দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাই জার্মানি ও ইটালিতে পুঁজিবাদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। পরবর্তীকালে যেসব দল মার্কসবাদের নামে জাতীয় কমিউনিস্ট হয়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থে কাজ করছে, তাদের দ্বারা অন্যদের কণ্ঠরোধ করা, অপরের যুক্তি শুনতে না দেওয়া এবং কর্মীদের অন্ধতা, উগ্রতা ও যান্ত্রিক শৃঙ্খলা ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার শক্তি হিসাবে কাজ করছে।

তিনি বলেন, ওরা যে উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের স্লোগান তুলে মানুষকে ধাপ্পা দিচ্ছে, তার পাশে দাঁড়িয়েছে টাটা বিড়লা আম্বানি— গোটা কর্পোরেট সেক্টর। তারাও বলছে উন্নয়ন হচ্ছে, শিল্পায়ন হচ্ছে। মাল্টিন্যাশনালরা বলছে উন্নয়ন হচ্ছে, শিল্পায়ন হচ্ছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতিনিধি এসে সিপিএম-কে সার্টিফিকেট দিয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গ নাকি উন্নয়নে এখন ভারতবর্ষের মধ্যে এক নম্বরে আছে! অথচ আমরা কী দেখছি? আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে বলতে গেলে, জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক বেকার, অর্ধবেকার ও কর্মচ্যুত। খেতমজুর প্রায় এক কোটির কাছাকাছি। এরাজ্যে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ। ১৭ লক্ষ কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছে। গত তিন বছরে এ রাজ্যে চাকরি পেয়েছে ৮৩.৫ হাজারের মতো, তাও অধিকাংশই ঠিকা মজুর, অস্থায়ী শ্রমিক। মজুরিও আইন অনুযায়ী নয়। অন্যদিকে, এই তিন বছরে চাকরি হারিয়েছে ৪ লক্ষ ২৪ হাজার জন। এই হচ্ছে 'উন্নয়ন'! আমরা দেখছি, এ রাজ্য শিক্ষায় একসময় প্রথম স্থানে ছিল, এখন ১৯ নম্বরে। সরকারি সমীক্ষাতেই দেখছি, বছরে কয়েক মাস অনাহারে থাকে এমন মানুষের সংখ্যায় ভারতবর্ষের মধ্যে এ রাজ্য হচ্ছে প্রথম স্থানে, আর সারা বছর অনাহারে থাকে এমন মানুষের সংখ্যায় এ রাজ্য হচ্ছে দ্বিতীয় স্থানে। দারিদ্র্যের জ্বালায় বাবা-মা সন্তান বিক্রি করে দিচ্ছে— এই দিক থেকে এ রাজ্য প্রথম স্থানে। নারী পাচারে, শিশু পাচারে এ রাজ্য প্রথম স্থানে। নারী ধর্ষণে এই রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে। এই হচ্ছে উন্নয়ন এবং এগুলো বাড়ছেই।

যথার্থ উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? উন্নয়ন বলতে বোঝায়, সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে, এক ধাক্কায় সবাইকে কাজ দিতে না পারলেও ক্রমাগত কর্মসংস্থান বাড়ছে এবং ছাঁটাই কমছে। উন্নয়ন বলতে বোঝায়, মানুষের মোটামুটি খাওয়া-পরার একটা সংস্থান আছে, লেখাপড়া ও চিকিৎসার সংস্থান আছে। ন্যূনতম এগুলোর তো দরকার! সেদিক থেকে রাজ্য কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? তার মানে কি উন্নয়ন কারোরই হচ্ছে না? উন্নয়ন হচ্ছে ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, মাল্টিন্যাশনালদের, বড় বড় ব্যবসায়ীদের। তাদের মুনাফার পাহাড় আরও স্ফীত হচ্ছে। সরকারি সমীক্ষাই বলছে, এদেশে গ্রামাঞ্চলে, ১০০ জনের মধ্যে ৩৩ জনের দৈনিক খরচ করার ক্ষমতা ১২ টাকা। আর শহরে ১০০ জনের মধ্যে ৩৩ জনের দৈনিক রোজগার ১৯ টাকা। এই ক্ষমতা যদি দ্বিগুণও করা যায়— অর্থাৎ ১২ টাকার জায়গায় ২৪ টাকা এবং ১৯ টাকার জায়গায় ৩৮ টাকা খরচ করার ক্ষমতা মানুষের আছে, তাহলে ভারতবর্ষের ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ এই পর্যায়ে রয়েছে। এই অবস্থায় নেতারা বলছে, দেশের অগ্রগতি হচ্ছে, জাতীয় আয় বাড়ছে। শহরে কিছু কিছু ফ্লাইওভার, আকাশচুম্বী বাড়ি, শপিং মল, বার— এইসব দেখে সমাজের যারা উচ্চবিত্ত অংশ, তারা খুশি, তারা এর মধ্যে উন্নয়ন দেখছে।

শিল্পায়ন কথাটার একটা মানে আছে। দু-পাঁচটা শিল্প গড়া মানেই শিল্পায়ন নয়। একথা

পাঁচের পাতায় দেখুন

‘একের বিরুদ্ধে এক’ স্লোগান শোষিত মানুষের স্বার্থবাহী নয়

চারের পাতার পর

আমরা বার বার বলেছি। শিল্পায়ন মানে হচ্ছে, জনগণের চাহিদা ও কেনবার ক্ষমতা বাড়ছে, ফলে বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ক্রমাগত কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা, লাগাতার শিল্প প্রতিষ্ঠা করা— এই হচ্ছে শিল্পায়ন কথাটার অর্থ। কিন্তু আমরা কী দেখছি? শিল্পাঞ্চল মরুভূমি। এই গঙ্গার দু’ধারে কী অবস্থা! দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত কলকারখানা—সর্বত্র তালাচাবি ঝুলছে। কোটি কোটি শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছে গোটা ভারতবর্ষে। গোটা বিশ্বের চেহারাও তাই।

পুঁজিবাদ আজ শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারে না

১৯১৫ সালে মহান লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির স্তরে পৌঁছে ব্যাঙ্কপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলন ঘটিয়ে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা লগ্নিপুঁজি বিশ্বের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলোতে রপ্তানি করছে সেখানকার সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমশক্তিকে লুঠ করার জন্য। এভাবেই তিনি পণ্য রপ্তানির সঙ্গে পুঁজি রপ্তানির মৌলিক পার্থক্য দেখিয়ে বলেন, সাম্রাজবাদ বা একচেটে পুঁজিবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ বা শেষ স্তর, ক্ষয়ের স্তর। এই স্তরে পুঁজিবাদ আর শিল্পের ও কৃষির বিকাশ ঘটাতে পারে না; প্রযুক্তির যত বিস্ময়কর উন্নয়নই হোক, এ যুগে পুঁজিবাদ ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংকট আরও বেড়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সংকট আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। এ সময় কমরেড স্ট্যালিনের শিক্ষা অনুসরণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট এখন এবেলা-ওবেলার। সকালবেলা একটু মাথা তোলে তো বিকাল বেলা ধুঁকছে, ক্রমাগত ইনজেকশন দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় ‘উন্নয়ন’, ‘শিল্পায়ন’ ইত্যাদি পুরোপুরি মিথ্যাচার। আজ গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতির গভীরে তাকালে দেখা যাবে সেখানে তীব্র বাজার সংকট, প্রবল দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা, উৎপাদন ব্যয় কমাবার জন্য শ্রমিক কমিয়ে উন্নত টেকনোলজির ব্যবহার চলছে ব্যাপকহারে। যাকে বলা হচ্ছে ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ ইন্ডাস্ট্রি। এটাই এ যুগের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ফলে বেকারত্ব বাড়বেই। ছাঁটাই বাড়বেই। দুটো কারখানা হবে তো পঞ্চাশটায় লালবাতি জ্বলবে। এখন একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশানালদের হাতে বিপুল পুঁজি অলস হয়ে পড়ছে, ব্যাঙ্কগুলোর হাতে বিপুল পুঁজি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। এ জিনিস পুঁজিবাদের পক্ষে সংকটের। মালিকদের ক্রমাগত পুঁজি নিয়োগ করে মুনাফা বাড়াতে হবে, নয়তো সে ডুববে। তাই অলস পুঁজি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পরিবর্তে মুনাফার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে শেয়ার মার্কেটের ফাটকা কারবার, নানারকম সুদের কারবার। পুঁজি এখন মূলত পণ্য উৎপাদন ছেড়ে শহর, নগর, বন্দর, রাস্তা তৈরি করছে, পরিকাঠামো তৈরি করছে। আগে কেউ কখনও এ সব শুনেছেন? আবাসন বা রিয়েল এস্টেট এখন একটা রমরমা ব্যবসা। বাড়ি তৈরি কর, বিক্রি কর। প্রথম শুরু করেছিল জাপান, তারপর আমেরিকা। সেই পথ এখন বিশ্বের সব দেশ নিয়েছে। আমাদের দেশেও তাই।

ফলে যে কথা আমরা বলেছি, টাটারা সিঙ্গুরের জমি নিল ঐ রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার জন্য। নামে একটা গাড়ির কারখানা হবে, বাকি বেশিরভাগ জমিতে আবাসন হবে। রাজারহাটেও তাই হয়েছে। কলকাতার কাছাকাছি জমি নিয়ে বড়লোকদের জন্য আধুনিক উপনগরী তৈরি করলে প্রচুর মুনাফা হবে। কলকাতার আশপাশে যেহেতু অধিকাংশই কৃষিজমি, তাই কৃষিজমিই চাই। আমরা তো প্রথম থেকেই বলেছি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রচুর অকৃষিজমি পড়ে আছে, যেখানে চাষ হয় না। শিল্প করতে হলে সেখানে করা হোক। এই তো পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে বালাজিরা ইস্পাত কারখানার কথা বলেছে। আমরা সেখানে বলেছি, জমির ম্যাপ দেখাও, অকৃষি জমি হলে আমাদের আপত্তি নেই। তবে আমাদের বক্তব্য, উপযুক্ত দাম দিতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিল্প হলে সেখানে জমি-হারা প্রত্যেক পরিবারকে কাজ দিতে হবে। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব করবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের প্রয়োজনে। সেখানে ডাউ নামের এমন একটা কুখ্যাত কোম্পানিকে আনছে যারা ভিয়েতনামে নাপাম বোমা সরবরাহ করেছিল। সিপিএম বলছে অনেক কর্মসংস্থান হবে। হলদিয়া পেট্রোকেমের জন্য ৪০ হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করেছে। কাজ পেয়েছে স্থায়ী ৬৭০ জন, আর ১২০০ ঠিকা শ্রমিক। তারাও অধিকাংশ বাইরের। টাটা তো সিঙ্গুরে সাফ জানিয়েছে, চাকরির গ্যারান্টি আমি দেবো না, আমি কিছু ট্রেনিং দিতে পারি মাত্র। সিপিএম নেতারা এমনভাব দেখাচ্ছে সিঙ্গুরে টাটার কারখানা হলে যেন রাজ্যে বিরাট অগ্রগতি হবে। টাটার অনেক বড় কারখানা আছে জামসেদপুরে দীর্ঘদিন ধরে। সেজন্য ঝাড়খন্ড রাজ্যে কি বিরাট উন্নয়ন হয়েছে?

সরকার গরিব চাষী-ক্ষেতমজুর-ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করে বিদেশি ও দেশি পুঁজিপতিদের জন্য স্পেশাল ইকনমিক জোন করছে, যেখানে শ্রমিকদের কাজের স্থায়িত্ব থাকবে না, যখন তখন ছাঁটাই করতে পারবে, কোন ট্রেড ইউনিয়ন রাইট্স থাকবে না, শ্রম আইন প্রয়োগ হবে না, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সকল কর মকুব করে দেবে, ক্ষতিপূরণে জনগণের উপর আরও ট্যাক্স চাপবে। এ ব্যাপারে তারা এতদূর গেছে যে, জনগণের টাকা দিয়ে সিঙ্গুরের কৃষিজমি কিনে তা টাটাকে দিচ্ছে প্রায় বিনামূল্যে— যে টাটারা ইংল্যান্ডে ৫০ হাজার কোটি টাকায় ‘কোরাস’ নামে একটা ডাচ ইস্পাত কারখানা কিনে ফেলল। বহুদিন আগেই আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ভারতের জাতীয় পুঁজি বিকাশের পথে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে, ব্যাঙ্কপুঁজি এবং শিল্পপুঁজির মিলন ঘটিয়ে ফিনান্স ক্যাপিটাল বা ধনকুবের গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। আমেরিকা, জাপান, জার্মানির তুলনায় দুর্বল হলেও ভারতও আজ একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বিশ্বের বাজারে তারাও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ঢুকছে। আজ আপনারা দেখছেন, টাটা, বিড়লা, আম্বানি গোষ্ঠীরা বিভিন্ন দেশে শিল্পে যৌথ উদ্যোগ করছে, কারখানা কিনছে, খনি কিনছে, তৈলক্ষেত্র ইজারা নিচ্ছে। এ সব সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য। এই উপমহাদেশে ভারতবর্ষ তো ইতিমধ্যেই একটি সম্প্রসারণবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে দেখা দিয়েছে।

দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ বলা হচ্ছে

তিনি বলেন, পুঁজিবাদ এক সময় ছিল ক্ষুদ্রপুঁজির স্তরে। তখন ছিল আঞ্চলিক অর্থনীতি। এরপর বিকাশের পথে অধিকাংশ ক্ষুদ্র পুঁজিকে গ্রাস করে এল বৃহৎপুঁজি। জাতীয় পুঁজির প্রয়োজনে জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় বাজার এল ও তার থেকে জাতীয় রাষ্ট্র, জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা এল। সেই পুঁজিবাদই একচেটিয়া পুঁজির স্তরে এসে জাতীয় বাজারের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য দেশের বাজারে ঢুকেছে। লেনিন দেখালেন, বিশ্বকে ভাগ করে লুটবার জন্য বিভিন্ন দেশের একচেটে পুঁজিপতিরা মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল গড়ে তুলেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, পুরনো ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেলের আরও উন্নত ও সংহত রূপ হচ্ছে আজকের যুগের মাল্টিন্যাশানাল বা ট্রান্সন্যাশানাল কোম্পানিগুলো। এরা মুনাফার স্বার্থে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর জাতীয় বাজারের নড়বড়ে প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সেই বাজার দখল করছে। আজকের যুগে এই পথেই নয়া উপনিবেশিক শোষণ ও আক্রমণ ঘটছে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ভূমিকা থেকে দেখা যাবে, নিজেদের জাতীয় বাজারের ক্ষেত্রে আজও তারা বিধি-নিষেধের শক্ত প্রাচীর রেখেছে, কিন্তু চাপ দিচ্ছে অন্য দেশের বাজার থেকে বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার জন্য। এদের স্বার্থেই আওয়াজ তোলা হয়েছে ‘জাতীয়তাবাদী চিন্তা এখন অচল’, আমাদের ‘গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি চাই’, অর্থাৎ মাল্টিন্যাশানালদের ও স্বদেশীয় একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজন ও স্বার্থ যেটা, তাকেই দেশের প্রয়োজন ও স্বার্থ বলে মনে করতে হবে। এর বিরুদ্ধতা করার মানে নাকি জাতীয় সংকীর্ণতা। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের যুগে জাতীয় পুঁজির বিকাশের স্বার্থে যে প্রগতিশীল পুঁজিবাদ জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, যে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিল, জনগণকে উদ্দীপিত করেছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে সেই পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করার পর উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে কোমর ভাঙা জাতীয় পুঁজিবাদ আগের মত বলিষ্ঠভাবে না পারলেও যতটা জাতীয়তাবাদী ঝাণ্ডাকে তুলে ধরেছিল, আজ মনোপলি ক্যাপিটাল ও ফিনান্স ক্যাপিটালের যথেচ্ছ লুণ্ঠনের প্রয়োজনে তা ছিন্নভিন্ন ও ধূলায় নিক্ষিপ্ত। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ এই লুণ্ঠনকারীদেরই অবাধ শোষণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। শ্রমজীবী জনগণ ওদের শোষণ যন্ত্রের মনুষ্যরূপী কাঁচামাল মাত্র। শুধুমাত্র নিজ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম ধ্বংস সাধনে, পরদেশ আক্রমণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার নিয়ে লড়ালড়িতে জনগণকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তারা ‘জাতীয় সেন্টিমেন্টে উস্কানি দেয়। দেশি-বিদেশি একচেটে পুঁজির স্বার্থেরই প্রতিনিধি হচ্ছে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক বা সরকারগুলো। কারখানা চালানোর জন্য যেমন মালিকদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজার চাই তেমনই সরকার হচ্ছে পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। কেন্দ্রে এন ডি এ বা ইউ পি এ জোটের শরিক দলগুলো সকলেই হচ্ছে পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। ফলে ম্যানেজারি রাখতে হলে এই দলগুলোকে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি, বিদেশি মাল্টিন্যাশানালদের স্বার্থ দেখতেই হবে। তাই দেখুন জনগণের এত বিক্ষোভ, আন্দোলন, আত্মদান কোনও কিছুই সিপিএমকে নিরস্ত করছে না, তারা কৃষিজমি দখল করতে বদ্ধপরিকর। নির্লজ্জের মতো টাটাকে জনগণের টাকায় ভরতুকি দিতে তারা পিছপা নয়। আমাদের দল এটা মানতে পারেনি। শিল্পায়ন নিয়ে তাদের এই ধাপ্পা, একচেটে পুঁজির স্বার্থে এই নগ্ন ভূমিকা আমরা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছি। বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস, তৃণমূল বা বিজেপি সকলেই কিন্তু ‘উন্নয়ন’, ‘শিল্পায়নের’ এই একই স্লোগান তোলে। কারণ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এটা প্রয়োজন। ওরাও তাদেরই স্বার্থ দেখছে ও তাদের ব্যাকিংয়ে পশ্চিমবঙ্গের গদিতে বসতে চাইছে। এখানেই আমাদের সাথে এইসব তথাকথিত বিরোধী দলগুলোর মৌলিক পার্থক্য। আমরা বলি, দেশের কৃষির আধুনিকীকরণ, যন্ত্রীকরণ, শিল্পায়ন এবং তার মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে গেলে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেজন্যই আমরা বলি, আজকের আন্দোলন আমাদের কাছে নিছক সিপিএম সরকার বিরোধী একটা গদি দখলের আন্দোলন নয়। আমরা কখনও, কোনও গণআন্দোলনকে এ চোখে দেখি না। কৃষিজমি রক্ষার জন্যও মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। আমাদের দেশের কৃষক, খেতমজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত জনগণের জীবনের যা কিছু সংকট তার সমাধান করতে হলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। আর এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের হয়েই কাজ করছে ক্ষমতাসীন দলগুলো— কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল ইত্যাদি এন ডি এ এবং ইউ পি এ জোটের শরিক দলগুলি।

ভোটে একের বিরুদ্ধে একের আওয়াজ কেন বিপজ্জনক

এই প্রসঙ্গেই আমি কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট বলতে চাই। মানুষের মধ্যে এখন প্রবল সিপিএম বিরোধী বিক্ষোভ। পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে, গণআন্দোলনকে যারা গদি দখলের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় তারা এই গণবিক্ষোভকে পুঁজি করে ভোটে বাজিমাত করতে একটা স্লোগান তুলে দিচ্ছে— একের বিরুদ্ধে এক। অর্থাৎ সিপিএমের বিরুদ্ধে সব দল এক হও। আমরা এখানে পরিষ্কার বলতে চাই, আমাদের কাছে একপক্ষ হচ্ছে শোষক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে যে শোষিত জনগণ, তারা হচ্ছে অপর পক্ষ। এই হচ্ছে জনস্বার্থের দিক থেকে যথার্থ একের বিরুদ্ধে এক। গণআন্দোলন থেকে নির্বাচন— সমস্ত লড়াইকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। না হলে বিরাট সর্বনাশের পথে আবার মানুষকে নিয়ে যাওয়া হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার দেশের মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, কোনও দল এবং কোনও নেতাকে অন্ধের মতো মানবেন না, ভিড় দেখে ছুটবেন না, প্রচার দেখে মত্ত হবেন না। না হলে বারবার ঠকেছেন, আবারও বারবার ঠকতে হবে। গভীর ব্যথায় তিনি বলেছিলেন, এ দেশের মানুষ কম রক্ত দেয়নি, কম প্রাণ দেয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে টাটা-বিড়লার পরিবারে কেউ প্রাণ দেয়নি, ফাঁসির মঞ্চে, গুলিতে, অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছিল মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষ। কিন্তু পরিণতি এমন হল কেন? টাটা-বিড়লারা কাজ হাসিল করল জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আপসমুখী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে সামনে রেখে। কারণ সেদিন এদেশের মানুষ রাজনীতি বিচার করেনি। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সুভাষ বসুর রাজনীতির সাথে গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির কোথায় ও কী পার্থক্য তা বিচার করে দেখতে চায়নি। সেদিনের বিপ্লবীদের কথা জানতেও দেওয়া হয় নি। ইংরেজরাও চেয়েছিল নেতৃত্ব গান্ধীবাদীদের হাতে থাকুক, ভারতের টাটা-বিড়লারাও তাই চেয়েছিল। তাই খবরের কাগজে, রেডিওতে গান্ধীবাদীদের পক্ষে তুমুল প্রচার আর ভিড় দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হল, সেইদিকে ছুটল। নেতাদের অন্ধের মত মানল, নেতারাও তাই চেয়েছিল । জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও সংঘবদ্ধতাকে তারা ভয় করত। পরবর্তীকালে এ রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী বিক্ষোভকে পুঁজি করে প্রথমে সিপিআই পরে সিপিএম ভোটে ফয়দা তুলেছে। আমাদের দল চাইত শুধুমাত্র কংগ্রেস বিরোধিতা নয়, একদিকে আশু লক্ষ্য জনগণের দাবিগুলি আদায় ও মূল লক্ষ্য পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে গণআন্দোলনগুলি গড়ে তোলা এবং সেই উদ্দেশ্যে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করা, স্থায়ী গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে নিচুতলা থেকে গণকমিটি গঠন ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা। কিন্তু সিপিএম তা মানত না, তারা পুঁজিবাদকে আড়ালে রেখে অসচেতন, অসংঘবদ্ধ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধতা করার মধ্যেই শেষ করে দিত;

ছয়ের পাতায় দেখুন

এমএলএ ও মন্ত্রী হওয়ার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলেননি

পাঁচের পাতার পর

দাবি আদায় হোক আর না হোক, তাদের কিছু এসে যেত না, আন্দোলনে কিছু মানুষ প্রাণ দিতেন, মানুষের বিক্ষোভ বাড়ত, সেটাকেই পুঁজি করে ভোটের সময় তারা আওয়াজ তুলতো, 'শহীদের নামে শপথ নিন, আগামী ভোটে কংগ্রেসকে পরাস্ত করুন'। সংবাদপত্র সেদিনও আমাদের দলের কথা ছাপত না, কিন্তু সিপিএমকে বিরোধী দল হিসাবে জোর প্রচার দিয়ে তুলে ধরত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত জনগণও বলত, 'এখন কংগ্রেসকে হারাতে হবে, হারাতে হলে সিপিএমকে চাই', অর্থাৎ সেই একের বিরুদ্ধে এক-এর স্লোগান। সিপিএম-এর রাজনীতি কি, শ্রেণী চরিত্র কি, ক্ষমতায় গিয়ে কার হয়ে কি কাজ করবে, অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতায় ভেসে গিয়ে এসব সেদিন মানুষ বিচার করতে চায়নি। আজ পস্তাতে হচ্ছে। আজও একইভাবে সংবাদমাধ্যমের ব্যাকিংয়ে সিপিএমবিরোধী ক্ষোভকে পুঁজি করে তৃণমূল, বিজেপি, রাজ্য কংগ্রেস একের বিরুদ্ধে একের আওয়াজ তুলছে। এবারও কি জনগণ একই ভুল করবেন? যদিও সিপিএম-এর ভরসা যে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা তারা সহজে সিপিএমকে গদি থেকে সরে যেতে দেবে না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ট্র্যাডিশন ধ্বংস করতে হলে 'মার্কসবাদী' আলখাল্লা পরা 'বামপন্থী' সিপিএমকেই তাদের এখনও দরকার। আর ভরসা কেন্দ্রের বন্ধু কংগ্রেস সরকার।

কৃষির সাফল্য নিয়ে সিপিএম মিথ্যা বলছে

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সিপিএম প্রচার করছে '৬৭ ও '৬৯ সালে দুবার তারা সরকারে থেকে নাকি বেনাম জমি উদ্ধার করেছে, ভূমিহীনদের জমি দিয়েছে। প্রকৃত ইতিহাস হল, এ রাজ্যে বেনাম জমি উদ্ধার করেছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার, আজকের সিপিএম সরকার নয়। সেই যুক্তফ্রন্টে সিপিএম শরিক ছিল মাত্র। আমরা যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ দিই, আমরা বলেছিলাম, কংগ্রেস আমলে জমির উর্ধ্বসীমা আইন পাশ করা হলেও বেনাম জমি উদ্ধার হয়নি। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গ্রামাঞ্চলে বেনাম জমি উদ্ধার করতে হবে ও ভূমিহীনদের মধ্যে তা বিলি করতে হবে। চাষী আন্দোলন হয়েছিল। দু'বার মিলে যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ২২ মাস। ঐ সময়েই দশ লক্ষ একরের বেশি বেনাম জমি উদ্ধার হয়েছিল। আর আজকের সিপিএম সরকার ৩০ বছরে মাত্র ২ লক্ষ একরের কিছু বেশি বেনাম জমি উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করা জমি বণ্টন করার ক্ষেত্রেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের রেকর্ড ওদের থেকে অনেক বেশি। ফলে সিপিএম এখন যা দাবি করছে তা মিথ্যাচার। বর্গাদারদের ক্ষেত্রে তারা কী করেছে? যে সমস্ত জোতদার ও ধনী চাষী সিপিএমের পক্ষে, তাদের জমিতে বর্গা রেকর্ড করায়নি। অন্যদিকে ছোট চাষী হোক, মাঝারি চাষী হোক, যারা '৭৭-এর পর সিপিএমকে সমর্থন করছিল না, তাদের জমিতে বর্গা রেকর্ড করিয়েছে। এমনকী যেসব বর্গাচাষী সিপিএমকে সমর্থন করেনি তাদের জমিও কেড়ে নিয়ে আর একজনকে দিয়েছে। গোটা গ্রামাঞ্চলে ভূমিসংস্কারের নামে এসব জিনিসই তারা ৩০ বছর ধরে করে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ৩০ বছরে তারা নাকি কৃষির অনেক উন্নতি করেছেন। আমাদের প্রশ্ন, কংগ্রেস আমলের দামোদর ও ময়ূরাক্ষির পর তৃতীয় কোন একটি সেচের ব্যবস্থাও কি করেছেন তারা? চাষের ফলন বেড়েছে, একথা ঠিক। সে তো চাষীরা ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে, শ্যালো মেশিন বসিয়ে, উচ্চফলনশীল বীজ, কেমিক্যাল সার প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে হয়েছে। এখন অবশ্য এই কেমিক্যাল সারের ফলে ক্ষতিও হচ্ছে। উল্টে সরকার ডিজেল-পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, কৃষি-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করেনি। ফলে কৃষিতে এখন সংকট অনেক। তবুও সিপিএম দাবি করে তারা নাকি ভূমিসংস্কার, ভূমিবণ্টন, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি করে গ্রামীণ মানুষের জীবন উন্নত করে দিয়েছে। অনাহার, অর্ধাহার, ঋণের বোঝায় আত্মহত্যা, গ্রাম ছেড়ে দলে দলে বাইরে ছোটা, খেতমজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি, যারা জমি পেয়েছিল তাদের হাত থেকে জমি চলে যাওয়া ইত্যাদি গ্রামবাংলার চেহারা যারা জানেন তাদের কাছে সিপিএমের এই দাবি নিছক বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। তারা একদিকে কৃষিজমি দখল করে যেমন লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র চাষী ও খেতমজুরকে ভিখারি বানাচ্ছে, অন্যদিকে আম্বানিদের কৃষি বিপণনের রিটেল ব্যবসায় ঢুকতে দিয়ে কোটির অধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পথে বসাচ্ছে। সিপিএম বোঝাচ্ছে একটা দেশের অগ্রগতির চিহ্ন হচ্ছে শিল্পে শ্রমিক বেশি, কৃষিতে কম। এজন্যই তারা নাকি কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণ ঘটাতে চাইছে। কিন্তু অবস্থা কি এরকম যে, আমাদের দেশে ক্রমাগত শিল্পায়ন হচ্ছে, শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে, এবং সেজন্য কৃষি থেকে সারপ্লাস করে আরও শ্রমিক শিল্পে চাই। বরং উল্টোটাই এখন সত্য। শিল্পে ক্রমাগত শ্রমিক কমানো হচ্ছে, কৃষি থেকে উৎখাত হওয়া শ্রমিক শহরে ভিক্ষা করছে, কাজ নেই। এই অবস্থায় তাদের ঐ 'শিল্পে উত্তরণের' স্লোগানকে আরও কৃষিজীবীদের উৎখাত করে ভিখারি বাড়াবার প্রোগ্রাম ছাড়া কী বলা যায়!

কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের চরিত্র আলাদা নয়

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, গদি দখলের জন্য এখন যারা সিপিএমকে হটানোর স্লোগান তুলছে সেই কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপির চরিত্র কী? লোকসভা ভোটে যখন কংগ্রেস হারল এবং বিজেপির এন ডি এ জোটের সরকার হল, তখন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি এসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর দলবলের যেন রাতে ঘুম হচ্ছিল না। আসল লক্ষ্য ছিল বিজেপি বিরোধী বিক্ষোভকে পুঁজি করে কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতায় আনা। কংগ্রেস ক্ষমতায় এল, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি আরও বাড়লো। এখন দেখুন এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে পুঁজি করে বিজেপি আবার মাথা তুলছে। বুর্জোয়া রাজনীতিতে এই পাল্টাপাল্টি এখন চলছে। পুঁজিপতিরাই প্রয়োজনে পাল্টাপাল্টি করায়। নন্দীগ্রামে গণহত্যার পর সমবেদনা জানাতে যে বিজেপি ও কংগ্রেস নেতারা সেখানে ছুটে গেলেন, তারা নিজেরা কলিঙ্গনগরে কী করেছেন, মহারাষ্ট্রে কী করেছেন? এখানে সিপিএম যা করছে, একই কাজ ওড়িশায় বিজেপি-বিজেডি সরকার করেছে, গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নরহত্যার রেকর্ড বিজেপির শাসনেই ঘটল। কত মা-বোনেরা ধর্ষিতা হলেন। সেই বিজেপির এন ডি এ জোটের শরিক তো তৃণমূল। তারা কি কখনও বিজেপির এই অপকর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে? কলিঙ্গনগরে টাটাদের স্বার্থে আদিবাসীদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে? এনডিএ যখন সেজের পরিকল্পনা করেছে, তখন কি প্রতিবাদ করেছে?এন ডি এ জোট ছেড়ে এসেছে? ২০০৩ সালে সিপিএম বিধানসভায় যখন সেজের আইন পাশ করেছে তখন আমাদের দল একা প্রতিবাদ করেছে, তৃণমূল প্রতিবাদও করেনি। এ রাজ্যে এখন গণবিক্ষোভকে ভোটের স্বার্থে কাজে লাগাতে তারা নেমে পড়েছে। সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে লড়াই করেছে জনগণ। অনেকে বলছেন, এমনকী সিপিএমের মধ্যে যারা এখনও সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন তারা ত বলছেন, যারা খোঁজখবর রাখেন তেমন অনেকেই বলছেন, এস ইউ সি আই ছিল বলেই আন্দোলন এতদূর এগোল। সিপিএম নেতারাও কর্মীদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন এই বলে যে, এস ইউ সি আই-এর জন্যই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন এতদূর গেল, শুধু তৃণমূল থাকলে এত ঝামেলা হত না। হ্যাঁ, একথা ঠিক, সিঙ্গুরে আমাদের দলই প্রথম জনগণকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়, গণকমিটি গড়ে তোলে। নন্দীগ্রামেও ২০০৫ সাল থেকেই আমরা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করেছি, গণকমিটি গঠন করেছি। কিন্তু সিঙ্গুরে আমাদের থেকেও তৃণমূলের প্রাধান্য বেশি ছিল। মানুষ মার খেল, তিন তিনটি প্রাণ চলে গেল, একজন কিশোরী ধর্ষিত হয়ে নিহত হল, সিঙ্গুরই নন্দীগ্রামকে জাগিয়ে দিয়ে গেল, অথচ সিঙ্গুরে দাবি আদায় করা গেল না। কারণ তৃণমূল নেতৃত্ব ভোটের রাজনীতি ছাড়া কিছু বোঝে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য পাবলিসিটি, যেটাকে তারা ভোটের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে। সিঙ্গুরে ওরা কিছু বিক্ষোভেই আন্দোলনকে আটকে রাখতে চেয়েছিল, জনগণ সংগঠিত হয়ে প্রত্যক্ষ লড়াইতে নামুক এটা চায় নি। পদে পদে বাধা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ব্যপক মানুষ, মহিলারা, যুবকেরা জমি রক্ষার জন্য মাঠে নামলো, মার খেয়েও লড়লো। তখন প্রয়োজন ছিল এই লড়াইয়ে সমগ্র সিঙ্গুর থানার জনগণকে নামানো, গোটা রাজ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা সেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এককভাবে ৫ই জানুয়ারি '০৭ সাধারণ ধর্মঘট ডেকে জেলায় জেলায় ডিএম,এসপি,এসডিও দপ্তর অবরোধের কর্মসূচি নিয়েছিলাম। তখন তৃণমূল সিঙ্গুরে আন্দোলন সম্প্রসারিত করা দূরের কথা, সিঙ্গুরে লড়াই থামিয়ে নেত্রীর আমরণ অনশন শুরু করালো, সিঙ্গুরে গোটা আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। নেত্রী অনেক পাবলিসিটি পেলেন, কিন্তু সিঙ্গুরের জনগণ কী পেল? নন্দীগ্রামে এটা সম্ভব হয়নি, কারণ যে এলাকায় এই লড়াই হয়েছে সেটা কিছুকাল আগেও সিপিএমের ঘাঁটি ছিল। আমরা সেখানে কাজ শুরু করেছিলাম। আমাদের সংগঠন সেখানে খুব বিরাট নয়, লড়াইয়ের মধ্যে আমরা প্রধান শক্তি ছিলাম একথা বললেও ভুল হবে। আমরা ছিলাম, আমরা আছি, সাধ্যমতো লড়াইকে সঠিক পথে রাখবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু লড়াই করেছে জনগণ। নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেমেছে অনেক পরে। তাই নন্দীগ্রামের গণঅভ্যুত্থানের জন্য কোনও রাজনৈতিক দলই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না, সব কৃতিত্বই সেখানকার জনগণের প্রাপ্য। কার্যত একটা গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তারা। কিন্তু এ কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি, প্রথমে আন্দোলনের সূচনা করতে, গণকমিটি গড়ে তুলতে, মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে এবং এই আন্দোলনকে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। রাজ্যের সমস্ত জেলায় মিছিল, অবরোধ, ঘেরাও ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমাদের কর্মীরা রক্ত ঝরিয়ে আন্দোলনের বার্তা জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে। যতগুলো সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে, তার মধ্যে ৫ই জানুয়ারি আমরা একা ডেকেছিলাম, বাকি সব বনধ্ আমরাও ডেকেছি, তৃণমূলও ডেকেছে। কিন্তু সেই বনধ্ সফল করার জন্য জনগণ তৃণমূলকে রাস্তায় বিশেষ দেখেনি, দেখেছে আমাদের দলের কর্মীদের। যদিও সংবাদমাধ্যম পাবলিসিটি দিয়ে এখন দেখাচ্ছে যেন তৃণমূলই সবকিছু করছে, আর এসইউসিআই-এর প্রায় নামগন্ধও নেই, নেহাৎ বাধ্য হয়ে কখনও সখনও একটু আধটু উল্লেখ করেছে, কারণ বিনা পাবলিসিটিতে এই দল শক্তিবৃদ্ধি করেছে, ১৯৭৭ সাল থেকে একা লাঠি, গুলি খেয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে কত আন্দোলন করেছে, এই দলের জন্যই সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে প্রতিরোধ সংগ্রাম এত মিলিট্যান্ট রূপ নিল, মহিলারাই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে এল, ফলে এই দলকে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের খুবই ভয়। এমনকী নকশালপন্থী দু/চার জন বাইরের থেকে মাঝে মাঝে গেছেন, তাঁদেরও অনেক পাবলিসিটি দিতে মিডিয়ার অসুবিধা হয়নি, কারণ ওদের থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন সেই তৃণমূল ভোটে ফায়দা তোলার জন্য আওয়াজ তুলেছে, একজোট হয়ে সিপিএমকে সরাতে হবে। আমাদের কাছে এই প্রস্তাবও এসেছে যে, এস ইউ সি আই সংগঠিত দল, এই বিরোধী জোটে গেলে আমরা লাভবান হব, ঐক্যের মূল কেন্দ্রে থাকবে আমাদের দল। বহু বিভ্রান্ত অথচ সৎ মানুষও সিপিএমকে একটা ধাক্কা দিতে চান। এটা আমরা বুঝি, কিন্তু আমরা বলতে চাই ভোটভিত্তিক রাজনীতি এস ইউ সি আই করে না। গণআন্দোলন আমাদের কাছে ভোটের প্ল্যাটফর্ম নয়। এম পি, এম এল এ, মন্ত্রীত্ব আমাদের লক্ষ্য হলে আমরা ২০০১ সালেই সিপিএম-এর প্রস্তাবে রাজি হতাম। ওরা আমাদের ডেকেছিল। আমরা বলেছিলাম, তোমরা বামপন্থাকে ফেলে কংগ্রেস, বিজেপির রাস্তায় সরকার চালাচ্ছ। ফলে আমরা রাজি নই। রাজি হলে অনেক এমএলএ, মন্ত্রিত্ব পেতাম। পরের ভোটে তৃণমূলের সাথে বোঝাপড়া করে লড়বার প্রস্তাবও এসেছিল। আমরা যাইনি, কারণ আমরা গদির জন্য লালায়িত নই, আমরা একটা নীতিনিষ্ঠ মার্কসবাদী দল। মুখে জনগণ জনগণ বলব, বিপ্লবের কথা বলব, আর তলে তলে মন্ত্রী হওয়ার জন্য ছুটবো, এই রাজনীতি করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ এত কষ্ট করে এস ইউ সি আইয়ের প্রতিষ্ঠা করেননি। আমরা নীতিবাগীশ নই, আবার আমরা সুবিধাবাদেরও বিরুদ্ধে। যখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, পুরনো নীতিতে আর চলে না, নতুন নীতি চাই, তখনও পুরনো নীতিকে আঁকড়ে থাকাই হচ্ছে নীতিবাগীশতা। আবার ভোটের আশু সুবিধার প্রয়োজনে বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে, এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী হওয়া, নেতাদের নাম-যশ-প্রভাব বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে মূল নীতি বিসর্জন দেওয়া, এটা হচ্ছে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ, এর চর্চা আমরা করি না। আমরা জানি, আগামী নির্বাচনে 'একের বিরুদ্ধে এক' এই আওয়াজ নিয়ে হয়ত ঝড় তোলা হবে। তার বিরুদ্ধেই হয়তো আমাদের দাঁড়াতে হবে। তবুও আমরা জনগণের সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না। সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্থী বিকল্প তৈরির স্কিমে সামিল হতে পারব না। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, মার্কসবাদের আদর্শে, সংগ্রামী বামপন্থী ধারায় শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলে তার দ্বারাই একমাত্র সিপিএমকে পরাস্ত করা সম্ভব। অন্য কোনও পথে নয়। সিপিএমকে সরিয়ে আজ যে বিকল্পের কথা বলা হচ্ছে, তারা যদি ক্ষমতায়ও যায়, তবে তারা কি অন্যরকম কিছু করবে? তারাও একইভাবে কৃষিজমি দখল করবে, সেজ করবে, তারাও শ্রমিক-কৃষকের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে, একইভাবে অত্যাচার চালাবে। আজ যে চা-বাগানের শ্রমিক অর্ধাহারে, অনাহারে ধুঁকছে, চটকলের শ্রমিকরা মার খাচ্ছে, তাদের পাশে কি কংগ্রেস দাঁড়াচ্ছে, তৃণমূল বা বিজেপি দাঁড়াচ্ছে? তারা দাঁড়াতে পারে না।

মূল শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ

আমরা মনে করি, আজকের দিনে জনজীবনে যত সঙ্কট আসছে তার জন্য দায়ী দেশিয় পুঁজিবাদ ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ। এদের হয়ে কাজ করছে সরকারি দলগুলি পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে। আর কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব হচ্ছে কে দেশি-বিদেশি পুঁজির আশীর্বাদে ভোটে পলিটিক্যাল ম্যানেজার হতে পারে। এই অবস্থায় কোন দল জনগণের স্বার্থে সিরিয়াসলি তখনই লড়তে পারে যখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লড়বে। এই বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলি অতি ধূর্ততার সাথে মূল শ্রেণী শত্রুকে

সাতের পাতায় দেখুন

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মুম্বাইয়ে সভা

এস ইউ সি আই মুম্বাই-থানে ইউনিটের উদ্যোগে গত ২৫ এপ্রিল মুম্বাই সেন্ট্রালে তারদেও-তে অবস্থিত জনতা কেন্দ্র হলে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড কুমার কুলশ্রেষ্ঠ। সভা সঞ্চালনা করেন কমরেড উমাশঙ্কর মৌর্য। প্রধান বক্তার ভাষণে দলের পশ্চিমবঙ্গ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ বর্তমানে তীব্র সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে, ফলে জনজীবনের সমস্যা প্রতিদিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। একদিন সমাজের প্রয়োজনেই সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ এসেছিল। তারপর বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়ে বাজার সঙ্কটকে কেন্দ্র করে প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পার করে বর্তমানে তৃতীয় তীব্র বাজার সঙ্কটের যুগে সেই পুঁজিবাদ চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নিয়েছে এবং ক্রমাগত সঙ্কটের পর সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে। যারা চূড়ান্ত সঙ্কটগ্রস্ত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই শিল্পের এবং অর্থনীতির অগ্রগতির কথা বলছে, তারা পুঁজিবাদের নিকৃষ্ট দালাল ছাড়া আর কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গেও সিপিএম সরকার শিল্পায়নের ধুয়া তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে নির্লজ্জভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থরক্ষায় নেমেছে। বিশেষ আর্থিক অঞ্চল গড়ে শ্রমিকদের উপর নির্মম শোষণ চালিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বিপুল মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিতে তারা কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে সামিল হয়েছে। এর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামের জনগণ যে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, তা গোটা ভারতবর্ষের শোষিত জনগণের কাছে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। সভায় মুম্বই ইউনিট ইনচার্জ কমরেড অনিল ত্যাগী ও কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মাও বক্তব্য রাখেন।

কর্ণাটকে ২৪ এপ্রিল উদ্‌যাপিত

২৪ এপ্রিল বাঙ্গালোর শহরের বিজয়নগরে এস ইউ সি আইয়ের ৫৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কে উমা। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ কোন্ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এস ইউ সি আইকে সর্বহারার মহান নেতা এযুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ গড়ে তুলেছিলেন, তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বুর্জোয়া দলগুলি আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। জাতভিত্তিক স্বজনপোষণ, চূড়ান্ত স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতার লোভে এরা নিমজ্জিত। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদকে রক্ষার রাজনীতিতে নামলে দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়ে উপায় নেই। তিনি বলেন, কংগ্রেস, বিজেপি জেডি(এস) প্রভৃতি চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলির স্বরূপ মানুষ জানে, এখন নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুরের ঘটনায় মানুষ সিপিআই(এম), সিপিআইকে চিনতে পারছে। এই মেকি মার্ক্সবাদী দলগুলি শ্রমিকশ্রেণী এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

সভার অপর বক্তা, বাঙ্গালোর জেলা সম্পাদক কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ দলের দ্বারা পরিচালিত 'বাঙ্গালোর বাঁচাও আন্দোলন' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

সভাপতির ভাষণে কমরেড কে উমা শ্লোগানসর্বস্ব বামদলগুলির থেকে এস ইউ সি আইয়ের পার্থক্য কোথায়, তা ব্যাখ্যা করেন।

আলিপুর কারাগারে ২৪শে এপ্রিল

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই-এর ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। মিথ্যা মামলায় দণ্ডিত ও বিচারাধীন দুই শতাধিক এস ইউ সি আই নেতা, কর্মী এবং সাধারণ বন্দী ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই ঐতিহাসিক দিনটি উদ্‌যাপন করলেন এক সভার মাধ্যমে। এই মহতী সভার আয়োজক ছিলেন কমরেডস প্রফুল্ল মণ্ডল, অনিরুদ্ধ হালদার ও অশোক চক্রবর্তী। এদিন সকাল থেকেই কমরেডদের আচরণে ছিল এই দিনটির যথার্থ উপলব্ধির প্রতিফলন।

সভার প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। কমরেড অশোক চক্রবর্তী এবং বাঁশিনাথ গায়েনের প্রস্তাব অনুসারে সর্বসম্মতিক্রমে সভার সভাপতি নির্বাচিত হন দলের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী। সভার শুরুতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমিরক্ষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত এবং তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে এই কারাভ্যন্তরে বসেই এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাদের নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চর্চা করেছেন। সেই কৈশোরেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এত মানুষের আত্মত্যাগ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশের বিপ্লবভীত পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী গান্ধী-নেতৃত্বের হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করল। সেদিনই তিনি বুঝেছিলেন, যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর দলের অভাবেই এটা হতে পারলো। তাই জনাকয়েক সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের এক ছোট্ট হলে এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন।

সভাপতির ভাষণের পর প্রধান বক্তা কমরেড প্রবোধ পুরকায়েত তাঁর ভাষণে বলেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া সেই দল আজ ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে গরিব মানুষের সমস্যা প্রতিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছে, দাবি আদায় করছে। কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মতো এ রাজ্যের সিপিএম সরকারও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করছে। এবং তা করতে গিয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে পুলিশ ও সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনী যৌথভাবে গণহত্যা, গণধর্ষণ চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সঠিক পথে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় এস ইউ সি আই-এর গণভিত্তি বিস্তৃত হচ্ছে। এমতাবস্থায় কারাভ্যন্তরে নিরন্তর জ্ঞানচর্চা ও শৃঙ্খলারক্ষার মাধ্যমে দলের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করার শপথ নেওয়ার জন্য তিনি সকল সহবন্দীর কাছে আহ্বান জানান।

নন্দীগ্রামে গণহত্যাকাণ্ডে স্বজনহারা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও ত্রাণ বিতরণ উপলক্ষে

ছাত্র সমাবেশ

২২ মে, বেলা ৩টা, নন্দীগ্রাম

এ আই ডি এস ও

২৪শে এপ্রিলের আহ্বান ঃ সর্বত্র আন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি গড়ে তুলুন

ছয়ের পাতার পর

আড়াল করে গণবিক্ষোভকে সরকারী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ভোটে ফয়দা তোলার জন্য। তৃণমূলও একইভাবে ভোটের অঙ্কের দিকে তাকিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা ত দূরের কথা, বরং পুঁজিপতিদের মিটিংয়ে ডেকে আশ্বস্ত করে গোটা বিক্ষোভকে সিপিএম বিরোধিতায় কাজে লাগাচ্ছে। তারা একদিকে বিজেপি-এর এনডিএ জোটে থাকছে, অন্যদিকে কংগ্রেসের সাথেও সম্পর্ক রাখছে, লক্ষ্য শুধু এ রাজ্যেই নয়, দিল্লীরও গদি। জনগণকে গভীরভাবে ভাবতে হবে, তারা কি আবারও দল বিশেষের গদি দখলের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হবেন? যেকোনও চিন্তাশীল মানুষ জানেন, সিপিএম মানে বামপন্থা নয়, মার্কসবাদ নয়। আমাদের দল একটা সংগ্রামী বামপন্থী দল হিসাবে লড়ছে একা দাঁড়িয়ে। আমাদের কর্মীদের মনোবল, সাহস, সততা, চরিত্রের উৎস কী? মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমাদের শক্তির উৎস। আমরা ভোটেও লড়াই করি শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের আদর্শ নিয়েই। তার ভিত্তিতে যদি আসন পাই পাবো, না পেলে পাবো না। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটের বাজারে এইপক্ষ ওইপক্ষ এভাবে ভাগ করে জনগণ দেখবেন না; একদিকে শোষক শ্রেণীর পক্ষ, আর এক দিকে শোষিত জনগণের পক্ষ, এভাবে দেখতে হবে। জনগণের শক্তি যে কী প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, নন্দীগ্রাম তা দেখিয়ে দিয়েছে। কোন দলের জোরে নয়, নিজেদের লড়াইয়ের জোরেই তারা এতবার আক্রান্ত হয়েও দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে রচিত সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি রূপায়িত 'সেজ'-এর স্কিম নন্দীগ্রামে রুখে দিয়েছে, উদ্ধত সিপিএম সরকারকে মাথা নিচু করে ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে— 'নন্দীগ্রামে কৃষিজমি দখল করা হবে না'। চার মাস ধরে এই সংগ্রামী জনগণই অত্যাচারী পুলিশ-প্রশাসনকে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি, নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এ এক অনন্য নজির। ফলে বুঝতে হবে, সংগ্রামী জনগণের শক্তি কী বিশাল। দলমত নির্বিশেষে জনগণকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে-কলেজে সংগ্রামী কমিটি গড়ে তুলতে হবে, তাকে ভিত্তি করে থানা স্তরে, জেলা স্তরে এবং পরবর্তীকালে রাজ্যস্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি গঠন করতে হবে। জনগণের এই কমিটিই বিভিন্ন দলকে বিচার করবে, ঠিক করবে— কোন্ পথ ঠিক কোন্ পথ ভুল। তারাই ঠিক করবে কীভাবে লড়বে। ব্রিটিশ যুগ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও দল জনগণকে এভাবে সচেতন ও সংগঠিত করেনি, করতে চায়নি। এবার আমরা যে সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামে গণকমিটি গঠন করে কিছুটা চেষ্টা করেছি, সেগুলিকে কাজ করতে পদে পদে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। এমনকী পাবলিক বডি 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি' এবং নন্দীগ্রামের 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'কে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে তারা উপর থেকে দলীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়েছে বারবার, বারবার আমাদের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। কারণ ওরাও কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম-এর মতন জনগণের সচেতন, সংঘবদ্ধ, সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রতিরোধ সংগ্রামকে ভয় পায়। কারণ তাহলে ওদের ভোটের রাজনীতির নাগালের বাইরে চলে যাবে জনগণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের হাতিয়ার যে সোভিয়েটগুলো গড়ে উঠেছিল, বিপ্লবী বলশেভিকরা তাতে প্রথম দিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও পরে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে সেগুলিকে স্বপক্ষে আনে এবং সেই সোভিয়েটগুলোর মাধ্যমে জনগণের সচেতন, সংঘবদ্ধ, সক্রিয় ভূমিকার ফলেই ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হতে পেরেছিল। একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে সেই গণকমিটি গঠনের উদ্যোগ এ দেশে আমাদের এখন নিতে হবে। একদিকে সিপিএম সরকার, অন্যদিকে তার বিরোধিতা করার নামে দক্ষিণপন্থী ও সুবিধাবাদীদের জোট— এভাবে পশ্চিমবঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করে আমরা চালিত হতে দিতে পারি না। একেবারে নিম্নস্তর থেকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে যে গণকমিটি গঠন করার কথা আমরা বলছি, সেই গণকমিটির মধ্যে সিপিএম, সিপিআই, তৃণমূল, কংগ্রেস যে দলেরই সমর্থক কর্মী হোন না কেন, সব মানুষই থাকতে পারেন, কোন দল করেন না তারা অবশ্যই থাকবেন, যেমন সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের আরও নানা জায়গায় হয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের বক্তব্যের বিচার গণকমিটিই করবে। কোন পথটা তারা নেবে, কোন দলের কথাকে তারা গ্রহণ করবে, আন্দোলনের কর্মসূচি কী নেবে, লক্ষ্য কী হবে— সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে গণকমিটিই গ্রহণ করবে। গণআন্দোলনের স্বার্থে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর যেটা আমরা বলছি তা হল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে, মহান লেনিন-স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার সিপিএমকে দেখিয়ে বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া শক্তিগুলো এবং তাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। একদল সৎ মানুষও ক্রমাগত এইসব অপপ্রচার শুনে শুনে এবং সিপিএমকে মার্কসবাদী ভেবে বিভ্রান্ত হচ্ছেন, এঁদেরও যত্ন করে বোঝাতে হবে। কারণ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজ কোনও লড়াই, এমনকী জনগণের গণতান্ত্রিক দাবিতে কোনও আন্দোলনও আজকের দিনে গড়ে উঠতে এবং এগিয়ে যেতে পারে না মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে হাতিয়ার না করে। বাকি সমস্ত আদর্শ, চিন্তা, সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখারই শক্তি। এ সত্য আমাদেরকে যেমন বুঝতে হবে, জনগণকেও তেমন বোঝাতে হবে।

মনে রাখতে হবে, যতদিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, জনজীবনের সংকট আরও বাড়তেই থাকবে। আগামী দিনগুলি আরও ভয়ঙ্কর সংকটময় হতেই থাকবে। এর থেকে জনগণকে বাঁচাতে হলে, মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় শক্তিশালী গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সেইজন্য আমাদের দলের আরও শক্তিবৃদ্ধি চাই। চাই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান অনুযায়ী নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও চারিত্রিক মানকে আরও উন্নত করার সংগ্রাম। এখানেই ঐতিহাসিক ২৪শে এপ্রিল উদ্‌যাপনের সার্থকতা।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

গ্যাঞ্জেস জুটমিল শ্রমিক বস্তিতে পুলিশি হানা বন্ধের দাবি জানালেন বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার

গ্যাঞ্জেস জুটমিল সহ রাজ্যের সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য সিপিএম সরকার মালিকদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। শ্রমিকদের উপর কীভাবে তারা আক্রমণ নামিয়ে আনছে সেকথা ৭ মে এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শ্রমিকরা স্বরাষ্ট্র সচিব প্রসাদরঞ্জন রায়কে জানালেন।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা জানান, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ডিএ সমেত দৈনিক ১৫৩ টাকা মজুরি এই মিলের শ্রমিকদের প্রাপ্য। কিন্তু মালিক দিচ্ছে মাত্র ৭৩ টাকা, অর্ধেকেরও কম। এরই বিরুদ্ধে এবং আইনসঙ্গতভাবে প্রাপ্য বেতনের দাবিতে ৪ নভেম্বর ২০০৬ থেকে শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে।

এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য পুলিশ-প্রশাসন ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭, ৫০৪, ৫০৬ ধারা প্রয়োগ করে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে এবং গ্রেপ্তার করার জন্য গভীর রাতে শ্রমিক বস্তিতে পুলিশ হানা দিচ্ছে। গত ৩ মে মধ্যরাতে মগরা থানার পুলিশ ওল্ড লাইনে শ্রমিক উমেশ কুমার সাউয়ের বাড়িতে হানা দেয় এবং 'কোথায় উমেশ? ধর্মঘট করা, কাজ বন্ধ করা দেখিয়ে দেব', এই ভাষায় তাঁর বউদি এবং দাদাকে শাসিয়ে যায়। একইভাবে পি এফ ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার নিউ লাইনের বি ভাস্কর রাওয়ের স্ত্রীকে এবং শিবপুর বাইলেনের অযোধ্যালাল মাহাতোর স্ত্রীকেও পুলিশ শাসিয়ে যায়। পুলিশ শ্রমআইন এবং শিক্ষানবিশ আইন-১৯৬১ লঙ্ঘনকারী মালিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেই না, উপরন্তু ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে এবং রাতের বেলা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে গেলে মালিকের বিশ্বস্ত সেবক সিপিএম তাদের বাড়ি চিনিয়ে দিচ্ছে। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট ভাঙার জন্য রেলকোয়ার্টারে কংগ্রেসের পুলিশ যেভাবে হানা দিয়েছিল, আজ সিপিএমের পুলিশও সেভাবে হানাদারি চালাচ্ছে।

প্রতিনিধিরা পুলিশের এই পক্ষপাতমূলক আচরণ বন্ধের দাবি জানালে স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন, তাঁর কিছু করার নেই। তিনি প্রতিনিধিদের মানবাধিকার কমিশনে যাওয়ার পরামর্শ দেন। একথা শুনে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা বলেন, ভাড়াটে বাহিনীর মতো সরকারের পুলিশকে মালিক ব্যবহার করছে। সিপিএম সরকার এবং সিপিএম দল উভয়েই আজ শ্রমিকদের আন্দোলন ভাঙার কলঙ্কিত হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর হামলা চালায়। এদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পাল, বীরেন্দ্র দাস, মহঃ মুন্না আনসারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ কোন হামলাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। অন্যদিকে শ্রমমন্ত্রীও আইনসঙ্গত পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট নিরসনে কোনও ভূমিকাই নিচ্ছেন না। শ্রমমন্ত্রী কার্যত মালিকমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করছেন। মালিক-সরকার এবং সিপিএম চক্র আজ শ্রমিকদের আইনসঙ্গত পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়েছে।

ক্ষতিপূরণের নামে প্রতারণা ঃ রায়দিঘীতে বিশাল সমাবেশ

নন্দীগ্রাম গণহত্যা ও সিঙ্গুরে পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে ৪ মে থেকে ১১ মে যে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তার অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রায়দিঘীতে ১১ মে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট জননেতা ও বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড সহদেব নস্কর।

সভায় জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সনাতন দাস বলেন, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মতো রায়দিঘীতেও দিঘীরপাড়ের ঘনবসতি গ্রামগুলির বাস্তুজমি, দোকান সহ ব্যাপক জায়গা থেকে সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ করে উন্নয়নের নামে পর্যটন কেন্দ্র, শপিং মল, মৃগয়ারণ্য করার অজুহাতে বিস্তীর্ণ এলাকা দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে রাজ্য সরকার। মণি নদীতে ব্রিজ তৈরির জন্য রায়দিঘীর মীনবাজারের যে জায়গা সরকার অধিগ্রহণ করেছে, রায়দিঘী ভূমিরক্ষা কমিটির অনুরোধে সরকারের জমি রেজিস্ট্রি অফিস জানিয়েছে — সেই জায়গার দাম শতক পিছু ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। অথচ ঐ অঞ্চলের মানুষ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাচ্ছে শতক পিছু মাত্র ১৩ টাকা ১৭ পয়সা। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে জান বাজি রেখে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধান বক্তা জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে এস ইউ সি আই দলের কর্মী-স্বেচ্ছাসেবকরা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁরা জীবন বিপন্ন করে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের জন্য জোট নয়, জনস্বার্থে, জনগণের দাবি আদায়ের জন্য জনগণকেই এগিয়ে এসে গণকমিটি গঠন করতে হবে। গণআন্দোলনে সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব কেন প্রয়োজন, তা তিনি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। রায়দিঘী গোলপার্কের সামনে উপস্থিত তিন সহস্রাধিক মানুষের কাছে তিনি এস ইউ সি আই দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

সভার শেষে রক্তাক্ত সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিডিও ছবি বড় পর্দায় দেখানো হয়। শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনোবল দৃঢ় করতে এই সমাবেশ বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

ফ্যাসিবাদবিরোধী বিজয় দিবসে

তিনের পাতার পর

জনগণকে বহুলাংশে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু একথাও সত্য যে, এই সব স্ট্যালিনবিরোধী শক্তিগুলির কার্যকলাপ আজ তাদেরই মুখোশ খুলে দিচ্ছে। স্ট্যালিনবিরোধী প্রতিবিপ্লবীরা আজ রাশিয়ার জনগণকে ভিখারিতে পরিণত করেছে। বিশ্বের জনগণকে বাধাহীন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মুখে ঠেলে দিয়েছে। স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা এবং সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ব্যাপক মেহনতি জনগণকে যুদ্ধ ধ্বংস বেকারি দুর্দশা ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি। কঠোর বাস্তবের আঘাতে মানুষ আবার পথে নামছে, তাদের হাতে স্ট্যালিনের ছবি।

৯ মে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অন্ধতার বিরুদ্ধে যুক্তির, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতা ও কমিউনিজমের বিজয়। যতদিন ন্যায়ের জন্য মানুষ লড়বে ততদিন অন্যায়কে ক্ষমা করা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রামের দৃষ্টান্ত হিসাবে স্ট্যালিন আমাদের পথ দেখাবেন। ৯ মে এবং স্ট্যালিনকে মানবসভ্যতা মনে রাখবে চিরকাল।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাষ্ট্রপতির অভিমতের তীব্র বিরোধিতা করল এস ইউ সি আই

দেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে গত ১১ মে রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামের সুপরিকল্পিত সুপারিশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নির্মম পুঁজিবাদী শোষণে নিত্যদিন জর্জরিত সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভকে খর্বিত সংসদীয় গণতন্ত্রের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে ফেলার উদ্দেশ্যে ভারতের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের পছন্দের, হয় দুটি দল, না হয় দুটি জোটের মধ্য থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচনে জনগণকে বাধ্য করার দ্বারা কালক্রমে পিছনের দরজা দিয়ে জনগণের ওপর সাংবিধানিক একনায়কত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই করে চলেছে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে নতুন করে রাষ্ট্রপতির অভিলাষ ঘোষণা, বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই হীন চেষ্টাই নতুন উদ্যমে শুরু করার ইঙ্গিতবাহী।

দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে ছিটেফোঁটা আজও রয়েছে, তা হরণ করার উদ্দেশ্যে ঘোষিত এই সুপারিশের বিপদের দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমরেড মুখার্জী বলেন, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে প্রকৃত বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃত্বে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা ও তা ক্রমাগত তীব্র করা ছাড়া শাসকদের এই জঘন্য পরিকল্পনাকে রুখে দেওয়া সম্ভব নয়। মেকি মার্কসবাদী সিপিআই, সিপিএম, যারা ক্ষমতার লোভে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে সরাসরি আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকাই আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টির পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার, পছন্দ মতো প্রার্থী নির্বাচিত করার এবং অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার যে মৌলিক অধিকার জনগণের রয়েছে, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মধুমাখা বচনের আড়ালে রয়েছে সেই অবিচ্ছেদ্য নাগরিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার হীন ষড়যন্ত্র। এই হীন ষড়যন্ত্র বানচাল করতে জনগণকে সচেতনভাবে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিড়ি শিল্পে শ্রমিকদের ধর্মঘট নয় কার্যত লকআউট করেছে মালিকরা

বিড়ি শিল্পে দেশব্যাপী লকআউট জনিত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ১০ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

গত ৫ মে থেকে বিড়ি মালিকরা সারা দেশে বিড়ি উৎপাদন বন্ধ রেখেছেন। এটা ধর্মঘট নয়, কার্যত লকআউট। এর ফলে সারা দেশে ন্যূনতম মজুরি সহ সমস্ত রকমের আইনি ও ন্যায়সঙ্গত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রায় ১ কোটি বিড়ি শ্রমিক সরাসরি কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। ৬ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দাবি অনুযায়ী অবিলম্বে কারখানা খোলা ও লকআউটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্র এবং বিড়ি উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির ক্ষমতায় আসীন কোন সরকারই কার্যকরী কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। লকআউট এবং তার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ এবং অবরোধের মূল কারণ হিসেবে যা চিহ্নিত করা হচ্ছে, তা হল, ২০০৩ সালের টোবাকো আইনের একটি বিশেষ ধারা — যাতে বলা হয়েছে প্রতিটি বিড়ির প্যাকেটে নরকঙ্কাল ও মড়ার খুলির ছবি ছাপাতে হবে। এই বিষয়টিকেই প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়েছে এবং দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ মহলে এই বিরোধ মীমাংসার জন্য জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু ছবি ছাপানো স্থগিত রাখলে বা বন্ধ করলে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমিত হবে, বা কাজ হারানোর যে আতঙ্ক তাদের তাড়া করে ফিরছে তা দূর হবে বলে আমরা মনে করি না।

বস্তুতপক্ষে ২০০০ সালে এনডিএ আমলে ধূমপান নিয়ন্ত্রণের নামে একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত ২০০৩ সালে 'দি সিগারেট অ্যান্ড আদার টোবাকো প্রোডাক্টস (প্রহিবিসান অফ অ্যাডভার্টাইসমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন অফ ট্রেড, কমার্স, প্রোডাক্শন, সাপ্লাই এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন) অ্যাক্ট লোকসভায় গৃহীত হয়। তখন থেকেই এবং তারপর বিগত বছরগুলিতে আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হবে এবং যেহেতু প্রস্তাবিত আইন কার্যকর হলে বিড়ির মতো শ্রমনিবিড় মহিলাপ্রধান শিল্পে লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকদের কাজ হারানোর আশঙ্কা রয়েছে, তাই একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প কর্মসংস্থান নীতি ও পরিকল্পনা সরকারকে গ্রহণ ও ঘোষণা করতে হবে। পাশাপাশি সরকার যে জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকারকে যথার্থই মর্যাদা দিতে চান — তা প্রমাণ করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অভিজ্ঞতা বলছে, জনস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন অপরাধে সরকার অপরাধী।

কিন্তু এ বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার যেমন কিছু করেনি, একইভাবে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারও গত তিন বছরে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তারই সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের মূল দাবি থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা আবারও বলছি, সংশ্লিষ্ট আইনটি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক ডাকা হোক; অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক বিকল্প কর্মসংস্থান নীতি ও পরিকল্পনা এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি। এই লক্ষ্যেই বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

সাপ্তাহিক
গণদাবী
পড়ুন ও পড়ান

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in